শব্দ সম্ভবত সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণ'র মলাট থেকে উড়ে এসে বাঙলা সাহিত্যের অন্তরে জুড়ে বসেছে।

কাব্য ও সাহিত্য এ দুটি শব্দের যে শুধু নামের প্রভেদ আছে তাই নয়, ও দুয়ের অর্থেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। কাব্যের চাইতে সাহিত্যের এলাকা ঢের বেশী বিস্তৃত। কাব্য বলতে বোঝায় শুধু কবিতা ও আখ্যায়িকা। সাহিত্য বলতে আমরা ইতিহাস প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা রকমের রচনা বুঝি। অবশ্য গল্প ও কবিতা আজও সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়ে রয়েছে; শুধু যে রয়েছে তাই নয়, কবিতা না হোক্ গল্প আজ সাহিত্য রাজ্যের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছে। পৃথিবীর সকল লিখিয়ে দেশেই দেখা যায় যে, গল্প সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে; সুতরাং খুব সম্ভব তা বাঙলা দেশেও কালক্রমে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হয়ে উঠবে।

( ১৫ )

এই বিপুল পৃথিবী ও নিরবধি কালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখতে পাবেন যে, যাঁরা সাহিত্য-জগতের মহাপুরুষ বলে মানব সমাজে গণ্য হয়েছেন, তাঁরা সকলেই হয় কবি, নয় গল্পরচয়িতা; আর সেই ব্যক্তিকেই আমরা মহাকবি বলি, যিনি একাধারে ও দুই।

কিন্তু তৎসত্বেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এ যুগে কাব্য সম্বন্ধে একটা কু-সংস্কারের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। যাঁরা নিজেদের কাজের লোক বলে মনে করেন, অথবা তাই বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা ফাঁক পেলেই বলেন যে, 'আমরা কবিতা ফবিতা বুঝি নে"। সম্ভবত তাঁরা সত্য কথাই বলেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সকল সত্য প্রচার করা ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। মানুষ সেই ভাবেই মানুষের কাছে আত্মপরিচয় দিতে উৎসুক, যাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং 'আমি কবিতা বুঝি নে' এ কথা অহঙ্কারের সুরেই বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বক্তা 'কবিতা নে' বুঝি এই কথার দ্বারা প্রমাণ করতে চান, তিনি কাজ বোঝেন; যেমন অনেকে 'বাঙলা ভাল জানি নে' এ কথা বলেন শুধু এই প্রমাণ করতে যে, তিনি ইংরেজী খুব ভাল জানেন। উভয়েই এরূপ উক্তির দ্বারা সমান সুবিবেচনার পরিচয় দেন। বলা বাহুল্য, কোন বিষয়ে অক্ষমতা অপর কোন বিষয়ে ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। উপরোক্ত কু-সংস্কারের মূলে আছে এই ধারণা যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনও সম্বন্ধ নেই। এ কথা সত্য হত যদি জীবন মনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হত। তা যে নয়, তা সকলেই জানেন। আর মন অর্থ যে শুধু ব্যবহারিক মন নয় তার প্রমাণ, কর্ম্ম দিয়ে আমরা সকল জীবন ভরাট করে দিতে পারি, কিন্তু সমগ্র মন পূর্ণ করতে পারি নে; তার অনেকটা শূন্য থেকে যায়। মানব মনের সকল ক্রিয়াশক্তি তার সংসার-বাসনার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নয়। তা যদি হত, তাহলে মানবসমাজে ধর্ম্ম বলেও কোন জিনিষের সৃষ্টি হত না। বিষয়ে নির্লিপ্ত এবং দৈনন্দিন সাংসারিক ভাবনা থেকে মুক্ত-মানবী শক্তির লীলাই আর্ট, ধর্ম্ম, কাব্য প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পায়। আমরা প্রতিজনেই এ জাতীয় সৃষ্টির কর্ত্তা না হই, ভোক্তা ত বটেই। কাব্য-মনের এই অতিরিক্ত ও মুক্ত অংশেরই খোরাক। সে অংশটা অনেক কল্পনা, অনেক স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে রাখতে হয়। যাঁরা মানব-মনের সেই সব অস্পষ্ট ও অনিত্য কল্পনাকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারেন, তাঁরাই কবি।

আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, জীবনের সঙ্গে কাব্যের কোনই সম্বন্ধ নেই, তাহলে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের দৈনিক কর্ম্মজীবন কি এতই সুন্দর, এতই মনোরম ও এতই প্রিয় যে, আমরা এক দণ্ডের জন্যও তা ভুলে থাকতে পারি নে? কাব্যের আর কোনও গুণ না থাকুক, অন্তত এই মহাগুণ আছে যে, তা অন্তত দু'দণ্ডের জন্যও আমাদের কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের ভাবনা ভুলিয়ে দিতে পারে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মহা লোকহিতৈষী; সমাজের অর্থাৎ পরের কিসে উপকার হয়, সেই ভাবনাতেই তাঁরা মশগুল। যে সাহিত্য সমাজের ধরা-ছোঁয়ার মত কাজে লাগে, তদতিরিক্ত সাহিত্যকে তাঁরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। সকলেই জানেন যে, তেল নামক

পদার্থটা সমাজের বহুতর কাজে লাগে, যথা—খেতে, মাখতে, কল চালাতে, চাকায় দিতে—এমন কি progress-এর চাকাতেও। তাই এঁরা কবিদের সমাজের ঘানিতে জুড়ে দিতে চান্। আর তাতে যে গররাজী হয়, তাকে সৌখীন, বিলাসী, অলস, অকর্ম্মণ্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করেন। এঁদের কথার উত্তর দেওয়া বৃথা, কেননা জনগণ সে কথা কানে তুলবে না। কারণ তেল আমাদের সকলেরই চাই; সুতরাং তা যোগানো যে মহৎ কার্য্য, সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই।

তবে সামাজিক জীবনের উপর কাব্যের প্রভাব যে কি, তা আমাদের জীবনের উপর রামায়ণ ও মহাভারত নামক দু'খানি কাব্যের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

সত্য কথা এই যে, আমাদের স্পষ্ট ইচ্ছা ও ব্যক্ত বাসনাই আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষের অ-সংসারিক মনই মানুষকে মানুষের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ করে। আমাদের জীবনের মূলে যা আছে, তা তেল নয়—রস। জীবনের এই মূলধাতু নিয়েই কবির কারবার। বঙ্গসাহিত্য কাব্যে যে অপূর্ব্ব গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ বাঙলার রবি আজ সমগ্র সভ্যজগতকে উদ্ভাসিত করেছে।

( ১৬ )

আমি এখন বঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ কাব্যাংশের কথা ছেড়ে দিয়ে তার অপরাংশের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বঙ্গ-সাহিত্য শুধু উচুদিকে বাড়্ছে না, সেই সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হচ্ছে। এ ভাষায় বহুলোকে আজ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আজকের দিনে দেশের ইতিহাসের পরিচয় লাভ করতে হলে আমাদের আর পরের ভাষার দ্বারস্থ হতে হয় না। আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাই নে যে, ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে হেরডোটাস, থুসিডিডিস্, লিভি, ট্যাসিটাস্ প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙালীতে যখন ইতিহাস্ রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তখন ভবিষ্যতে বাঙলায় নব-গিবন মমসেনের জন্মের আশা আমরা করতে পারি।

ইউরোপে essay নামক এক শ্রেণীর সাহিত্যও আছে, যার বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান দর্শন কাব্য অলঙ্কার ইত্যাদি। এ শ্রেণীর সাহিত্যও বাঙ্গলাভাষায় স্থান পেয়েছে। আমাদের রচিত essay প্রভৃতির মূল্য যে কি, সে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। যদি কালক্রমে সে সব বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তাহলেও বলতে হবে যে, সে সব লেখা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। কারণ এই সব লেখাই এ সত্যের দলিল যে, আমাদের মন আজ সজাগ হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মুখও ফুটেছে। বাঙালীর আজ অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলবার আছে, এবং সে কথা তারা স্পষ্ট করে বল্তে শিখেছে। মনের বহু অব্যক্ত ভাব আজ ভাষায় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

( ১৭ )

যাকে মানুষে কাজের কথা বলে, তাও সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়। ধরুন এই পলিটিক্সের কথা। আজকের দিনে অনেকের বিশ্বাস এই যে, এর চাইতে বড় কাজের কথা ভূভারতে নেই। বাঢ়ং। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, দু'খানি সাহিত্যগ্রন্থ যুগ যুগ ধরে সে দেশের পলিটিক্যাল-মনের উপর প্রভুত্ব করেছে। মাকিয়াভেলির 'প্রিন্স' এবং রুশোর-Social Contract-হচ্ছে সে ভূভাগের পলিটিক্যাল চিন্তার পূর্ব্ব-মীমাংসা আর উত্তর-মীমাংসা। গত দু'শ' বৎসরের ভিতর ইউরোপে কম করেও দু' লক্ষ পলিটিক্সের গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করেছে; কিন্তু সে সব গ্রন্থই ও দুখানি বইয়ের হয় অনুবাদ নয় প্রতিবাদ—আর না হয় ত ও দুই মতবাদের একটা মীমাংসা মাত্র। এর কারণ কি? কারণ এই যে, মাকিয়াভেলি ও রুশো উভয়েই মানুষের পলিটিক্যাল মনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মর্ম্ম উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং যা আপাতদৃষ্টিতে কাজের কথা মাত্র, তা তাঁদের কাছে মানব-মনের চিরন্তন ভাবের কথা হয়ে উঠেছে। যাঁর কথা কর্ম্মের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের সন্ধান

আমাদের দেয়, তাঁর কথাই অমরত্ব লাভ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পলিটিক্সের কথা আমাদের মুখের কথাই থেকে যাবে, প্রাণের কথা হবে না, যত দিন না তা বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়। কাজের কথা জ্ঞানের দ্বারা, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির দ্বারা পরিষ্কৃত ও হৃদয়-রাগে রঞ্জিত না হলে তা সাহিত্যে স্থান পায় না। পরের কাছ থেকে ধারকরা মনোভাব আমাদের শুধু উত্তেজিত করতে পারবে কিন্তু আমাদের আত্মশক্তি প্রস্ফুটিত করতে পারবে না, যত দিন না সে ভাবকে অন্তরের বকযন্ত্রে চুঁইয়ে আমরা আমাদের মনের রক্তমাংসে পরিণত করতে পারি। যে অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে আমরা পর-মনোভাবকে অন্তরঙ্গ করতে পারব, সেই প্রক্রিয়ার ফলে এ বিষয়ে নব-সাহিত্যের সৃষ্টি হবে। পলিটিক্স যে কবে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা বলা কঠিন, কারণ তার আগে তা বঙ্গ-ভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। ওবস্তু আজও সম্পূর্ণ ইংরেজীর দখলে। এ দেশের পলিটিক্সকে মনের ধনে পরিণত করতে হলে তাকে এই পরভাষার অধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে। যত দিন আমরা তা করতে না পারি, তত দিন তা খবরের কাগজের দখলেই থেকে যাবে—অর্থাৎ তা হবে যুগপৎ অনুকরণ ও অনুবাদ। সংক্ষেপে জ্ঞান-মার্গের ও কর্ম্মমার্গের সকল বিষয়ই আমাদের ভাষার অন্তর্ভূত করতে হবে, নচেৎ বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হবে না।

( ১৮ )

জর্ম্মাণ দেশের বর্ত্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের যথার্থ মনের কথা তার সজ্ঞান মনের কথা নয়; সে কথা তার মনের গোপন কথা। আর সে কথা ধরা পড়ে তার স্বপ্নে, তার জ্ঞান-মূলক কর্ম্মে নয়। কথাটা শুনতে যতটা নতুন শোনায়, আসলে কিন্তু ততটা নতুন নয়। যুগ যুগ ধরে বহুলোকের মনে এ সত্যের একটা অস্পষ্ট ধারণা যে ছিল, তার পরিচয় বিশ্ব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে যাই হোক্, ফ্রয়েডের মত যে মূলত সত্য, সে বিষয়ে ইউরোপের বর্ত্তমান দার্শনিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

যেমন ব্যক্তিবিশেষের, তেমনি জাতিবিশেষেরও যথার্থ মনের কথা তার কাব্য থেকেই জানা যায়; কারণ কাব্য হচ্ছে তার কল্পনার সৃষ্টি—ভাষান্তরে তার দিবা-স্বপ্নের ভাষায় গড়া প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। আমরা প্রত্যেকেই যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদের সুষুপ্ত মন কাব্য রচনা করে। সে ক্ষণস্থায়ী ও অস্পষ্ট কাব্যের সঙ্গে সাহিত্যের কাব্যের প্রভেদ এই যে, এ কাব্য সুস্পষ্ট আর চিরস্থায়ী।

বাঙালীর মনের বিশেষ প্রকৃতি ও গতির যদি পরিচয় নিতে হয় ত তা' নিতে হবে বাঙালীর রচিত গল্প ও গান থেকে। আজকের দিনে এলিজাবেথের যুগের ইংরেজী মনের সন্ধান জানবার জন্য আমরা যেমন বেকন-এর দ্বারস্থ হই নে, হই শেক্সপিয়ার-এর; ভবিষ্যতে লোকে তেমনি অতীত বাঙালী-মনের পরিচয় লাভ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হবে, এ যুগের কোনও জ্ঞানীর শরণাপন্ন হবে না। আবার আমরাও যদি আমাদের জাতের ভবিষ্যৎ মানসিক প্রকৃতির বিষয় কৌতূহলী হই, তাহলেও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রবৃদ্ধ নব-ধারার দিকে নজর দিতে হবে।

( ১৯ )

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ যুগে যা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাচ্ছে, তা হচ্ছে গল্প। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, যুগধর্ম্ম অনুসারে পৃথিবীর সাহিত্য-রাজ্য এ যুগে গল্পের অধিকারে আসছে। এ সব গল্পের গুণ বিচার না করেও এ কথা বলা যায় যে, এ ব্যাপার আমাদের আশার কথা। যে জমিতে ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে জমি যে উর্ব্বর সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই। এই গল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনাতীত উৎপত্তিই প্রমাণ যে, বাঙালীর মনের জমি দিন দিন বেশী উর্ব্বর হয়ে উঠছে।

এই গল্প-সাহিত্যের প্রতিপত্তি দেখে অনেকে ভয় পান। তাঁদের ধারণা যে, গল্প-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি সৎ-সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আগাছার উপদ্রবে যেমন ভাল গাছ মারা যায়, তেমনি সাহিত্যের এই আগাছা

উঁচুদরের সাহিত্যকে নাকি উচ্ছেদ করবে। এ ভয় আমি পাই নে। কারণ উঁচুদরের সাহিত্য বলে যদি কোনও সাহিত্য থাকে ত কোনরূপ পারিপার্শ্বিক নীচু সাহিত্য তার বিনাশ সাধন করতে পারবে না। যে সাহিত্য সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, ও মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে না তা উঁচুদরের সাহিত্য নয়।

গল্প-সাহিত্যের যে অনেকের কাছে যথোচিত মান্ত নেই তার একটি কারণ এই যে, অনেকের বিশ্বাস ও-শ্রেণীর সাহিত্য-রচনা করা অতি সহজ। ঠুংরী যে সঙ্গীত-রাজ্যে উচ্চপদ লাভ করে নি, তারও কারণ এই যে, অনেকের ধারণা ওগান গাওয়া অতি সহজ; কারণ ঠুংরী শেখবার জন্য তাদৃশ কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না, যতটা করতে হয় ধ্রুপদ শিক্ষা করবার জন্য। কথা সত্য, কিন্তু সঙ্গীত বা সাহিত্য এর কোনটিরই শ্রেষ্ঠত্ব, কে কতটা মেহন্নত করেছে তার উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে রচয়িতার স্বাভাবিক ক্ষমতার উপর, শাস্ত্রে যাকে বলে প্রাক্তন সংস্কার তারই সদ্ভাবের উপর। সঙ্গীতপ্রাণ শ্রোতা মাত্রেই জানে যে, যথার্থ ঠুংরী শুধু সে-ই গাইতে পারে যার ভগবদ্দত্ত গলা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে সুরেলা কান ও সুরেলা প্রাণ। লোককে মেরেপিটে হয় ত চলনসই অর্থাৎ অচল ধ্রুপদী বানানো যেতে পারে, কিন্তু ও উপায়ে ঠুংরী-গায়ক বানানো যায় না। ও বস্তু যেমন-তেমন করে গাওয়া যেমন সহজ, ভাল করে গাওয়া তেমনই কঠিন।

পৃথিবীর সাহিত্যে গল্পের প্রাচুর্য্য দেখেই লোকের মনে এ ভুল ধারণা জন্মেছে। এবং তার ফলে অনেক লেখকও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছেন। যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তিনি তা না লিখে যে নিকৃষ্ট গল্প লিখছেন, অর্থাৎ গল্প-সাহিত্যের শরৎচন্দ্র হতে গিয়ে নষ্টচন্দ্র হচ্ছেন,—এর দৃষ্টান্ত বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল নয়। কথায় বলে "গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে"। এরূপ আনন্দ ধ্বনিও বাঙলায় নিত্য শোনা যায় এবং সে ধ্বনি অবশ্য শ্রোতার আনন্দবর্দ্ধন করে না।

এই সব কারণে আমি বঙ্গ-সাহিত্যের তরফ থেকে এ দাবী করতে পারি নে যে, আমাদের মাসিক পত্রে মাস মাস যত গল্প বিকশিত হয়, তা সবই কাব্য-কুসুম। তার বেশির ভাগই কাগজের ফুল, অর্থাৎ তাতে প্রাণ নেই মন নেই; আর সম্ভবতঃ এ-জাতীয় অনেক ফুল বিলেতি কাগজ কেটে বানানো। তবে পৃথিবীর কোন্ সাহিত্যের এই একই অবস্থা নয়? আমার বিশ্বাস সকল সাহিত্যেই অমূল্য কাব্যের সংখ্যা অতি কম, আর যার কোন মূল্য নেই তাই অসংখ্য। অসাধারণকে সাধারণ করা তেমনই অসম্ভব, সাধারণকে অসাধারণ করা যেমন অসম্ভব।

( ২০ )

এ সত্ত্বেও আমি এই গল্প-সাহিত্যের আতিশয্য বঙ্গ-সাহিত্যের একটা সুলক্ষণ বলে মনে করি। দশে মিলে যে জমি তৈরী করে যাচ্ছেন, তার উপরেই ভবিষ্যতে কাব্যের যথার্থ ফুল ফুটবে। আজকের দিনে বহু লেখকের রচিত গল্প যে কাব্য নয়, তার কারণ তাঁদের কল্পনা তেমন পরিস্ফুট ও পরিচ্ছন্ন নয়। কিন্তু এই নব-সাহিত্যকে আর এক হিসাবে দেখা যেতে পারে। গল্প-সাহিত্য থেকে জাতির নব-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যদি এই সাহিত্যকে আমাদের মনের শুধু দলিল হিসাবে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে, এর অন্তরে একটি নূতন আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। সে আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আমাদের জীবন নানা প্রকার চিরাগত আচার ও সংস্কারে বদ্ধ। বাঁধাধরা আচার-বিচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের কল্পনাই এই নব-সাহিত্যের মূল কল্পনা। এ সাহিত্য আকারে কতকটা বস্তুতান্ত্রিক হলেও, বাস্তবজীবনের প্রতিকৃতি নয়। কেন না, নব-সাহিত্যের কল্পনা বাস্তবজীবনের epi-phenomenon নয়, তার থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ উড়ো-কল্পনা। যে কল্পনার ভিত্তি জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কখনো কাব্যের সামগ্রী হতে পারে না। কিন্তু আমাদের যুবকরা আজ যে স্বপ্ন নিজেরা দেখছেন, সে স্বপ্ন তাঁরা বহু লোককে দেখাচ্ছেন। ফলে জাতির মন এই সব নূতন স্বপ্নে ভরে

উঠবে। এর ফল আমাদের সামাজিক জীবনের উপর যাই হোক, আমাদের মানসিক জীবনের সুর এক পর্দ্দা চড়িয়ে দেবে। যারা সামাজিক জীবনের উপর সাহিত্যের ফল সু কি কু বিচার করতে যান, তারা সামাজিক লোক ভবিষ্যতে বেশি সুখী হবে কি দুঃখী হবে তারই হিসেব করতে ব্যস্ত। এ ভাবনা সম্পূর্ণ বৃথা। কারণ সুখদুঃখ পৃথিবীতে চিরকাল ছিল, আজও আছে, এবং চিরকাল থাকবে। বদল হয় শুধু তার নামরূপের। সুখদুঃখ মনের জিনিষ, এবং মনই প্রতি যুগে তার বিভিন্ন রূপ দেবে। সে যাই হোক্, সাহিত্যের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট ক'রে তার স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তা আপনারাই বিবেচনা করবেন।

( ২১ )

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে যে বাক্‌বিস্তার করলুম, তার ভিতর হয় ত কোনও সার কথা নেই। আমি এ সভায় কোনও নব-বাণী ঘোষণা করবার জন্য উপস্থিত হই নি, এসেছি শুধু আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে, এবং সেই উপলক্ষ্যে আপনাদের পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। সুতরাং আমার কথা যথাসাধ্য আলাপের অনুরূপ করতে চেষ্টা করেছি। যদি অনেক বাজে কথা বলে থাকি ত সে প্রগল্‌ভতা আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করবেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে সাহিত্যের কথা সুহৃদ-সম্মিতবাণী, প্রভুসম্মিতবাণী নয়। এ মত আমি চিরকালই প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে এসেছি। প্রভুসম্মিতবাণী অর্থাৎ আদেশই সংক্ষিপ্ত হয়। আজ্ঞা প্রচার করবার অধিকার শুধু ধর্ম্ম-গুরুদের ও রাজপুরুষদেরই আছে। যারা লোক-মান্যও নয়, রাজমান্যও নয়, তাদের অর্থাৎ আমাদের মত সাহিত্যিকদের সে অধিকার নেই। তাই আমরা আমাদের বাণী এমন কোনও মন্ত্রাকারে প্রকটিত করতে পারি নে, যে মন্ত্র জপ করে লোকে মোক্ষ লাভ করবে; এমন কোনও সূত্রাকারে পরিণত করতে পারি নে, যে সূত্র লোকে ভক্তিভরে বক্ষে ধারণ করে দ্বিজত্ব লাভ করবে। মন্ত্র রচনা করা ও সূত্র রচনা করা হচ্ছে ধর্ম্মপ্রচারক ও পলিটিক্যাল প্রচারকদের ব্যবসা। সত্য কথা এই যে, সাহিত্য-জগতে কোনও প্রচারক নেই এবং থাকতে পারে না। এ রাজ্যে যিনি যে মুহূর্ত্তে প্রচারকার্য্য সুরু করেন, তিনি তন্মুহূর্ত্তে সরস্বতীর রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত হন—স্বাধিকারপ্রমত্ততার অপরাধে। এর কারণ সাহিত্য কোন বিষয় প্রচার করে না, সব জিনিষই প্রকাশ করে। তাই পৃথিবীতে ধর্ম্ম-সাহিত্য বলে এক জাতীয় সাহিত্য আছে যা ধর্ম্মের মন্ত্রভাগ নয় আর পলিটিকাল সাহিত্য বলেও এক জাতীয় সাহিত্য আছে, যা পলিটিক্সের যন্ত্রভাগ নয়; এ রাজ্যে প্রকাশই প্রচার, কেননা সাহিত্য আলোক-ধর্ম্মী। আর আলোর ধর্ম্মই এই যে, তা আপনা হতেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

( ২২ )

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে একটা মস্ত বড় আশা আছে; সে আশা যে দুরাশা নয়, আপনাদের কাছে তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েছি কি না বলতে পারি নে। মনে রাখবেন ভবিষ্যৎ বিষয়ের কোনও বর্ত্তমান প্রমাণ নেই। সে বিষয়ে আমাদের আশাই একমাত্র প্রমাণ।

মানুষের ভাষা একটা স্রোত, মানুষের মনও একটি স্রোত; এবং এই দুই স্রোতে মিলে যে স্রোতের সৃষ্টি করে, তার নাম সাহিত্য-স্রোত। অবশ্য এ স্রোতের অন্তরে কখনো আসে জোয়ার, কখনো ভাটা। আমার বিশ্বাস আমাদের সাহিত্যের অন্তরে এখন জোয়ার এসেছে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান একটা শুভলগ্ন।

রামপ্রসাদ বলেছেন যে,—

"প্রসাদ বলে থাক বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
(যখন) জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে
ভাটার বেলা॥"

ধর্ম্মের দিক থেকে দেখতে গেলে, এ উপদেশ যে খুব বড় কথা, তা আমি মানি। এ হচ্ছে ভগবানে আত্ম-সমর্পণের চরম উক্তি। আর দর্শনের দিক থেকে দেখতে

গেলেও দেখা যায় যে, এ সত্য কথা। মানুষের আকাশ-জোড়া অহঙ্কার নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়, যখন সে জানতে পায় যে, মানুষের ক্ষুদ্র অহং সৃষ্টি-প্রবাহের উপরে ভাসমান খড়কুটো মাত্র! "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—সেই অনন্ত রহস্যের ভাবনায় অভিভূত হলে মানুষের সকল ক্রিয়া-শক্তি একদম পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাই মানব-জীবনের কোন ব্যাপারেই রাম-প্রসাদের উপদেশ গ্রাহ্য নয়, সাহিত্যিক জীবনেও নয়। মানুষকে জোয়ারের সময় ভেটিয়ে যেতে হয়, ভাটার সময়েও উজিয়ে যেতে হয়, যদি তার কোনও নির্দ্দিষ্ট গম্যস্থান থাকে। আমরা যদি বঙ্গ-সাহিত্যের স্বরাজ্যলাভ করতে চাই ত আমাদের হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কে জানে কখন্ আবার ভাটা আসবে? বর্ত্তমান জোয়ারের উপর বেশি ভরসা রাখা যায় না। কেননা তা এসেছে বাইরে থেকে। আমরা যাতে এ জোয়ার চলে গেলে কাদায় না পড়ি, তার জন্য বঙ্গ-সাহিত্যে আমাদের অন্তরের জোয়ার বওয়াতে হবে। তা বওয়ানো, সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। এ ইচ্ছা আমাদের মনে জন্মলাভ করেছে, এখন তাকে শক্তসামর্থ্য করবার দায়িত্ব সমগ্র বাঙালী জাতির হাতে। আশা করি, এ দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা বাঙালীরা উদাসীন হব না—'কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি।'

---

# রুদ্রলীলা

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

নৃত্যপরা বাসুকীর কম্প্রফণা-'পরে  
ক্ষুদ্র মণিকার প্রায় বিষ-দগ্ধা ধরণী শিহরে।

ফণার নর্ত্তন-ভঙ্গে জাগিয়াছে তরঙ্গ-পর্ব্বত  
দীর্ণ করি' জীর্ণ তরী, চূর্ণ করি' ভগ্ন জলরথ।  
অরুণের শেষ রশ্মি—উন্মাদ সাগর নিলো তা'রে  
বাসুকীর বিষতপ্ত পাতালের নিদ্রিত কিনারে।  
নাগের নিঃশ্বাসে, হায়, সবে-পাতা খেলা যায় চুকি',  
উচ্ছ্বসিয়া, উল্লসিয়া নৃত্য করে উন্মত্তা বাসুকী।

বাসুকীর ফণাশীর্ষে ধরণী সে বিষ-দীপ্তা নীলা,  
মুগ্ধ করে সত্য, তবু দগ্ধ করা সেই তা'র লীলা।  
কালকূট বহ্নি-তেজে মহাকাশ দগ্ধ হ'য়ে যায়,  
মুক্তির মরীচি-তীর্থ বালুতপ্ত মরুভূমি-প্রায়।  
মানবের বক্ষ দোলে বাসুকীর বিষবহ্নি-তেজে,  
দোলে পৃথ্বী—বাসুকীর ফণা-শার্ষে ক্ষুদ্র মণি সে যে!

---

# ওমর-গুরু আবু আলি সিনা

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

পারস্যদেশে স্বাধীন চিন্তা, মতবাদ প্রচার, পাণ্ডিত্য গবেষণা দ্বারা যে সমস্ত মনস্বী ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-পাণ্ডিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আবু আলি সিনার নাম সসম্মানে ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। পারস্যদেশে আবু আলি সিনার মত চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্য-সৃষ্টিকার, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও সুকবি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একাধারে সর্ব্বতোমুখিনী প্রতিভার এরূপ একত্র সম্মেলন জ্ঞানীগণাগ্রণ্য ওমর খৈয়াম ভিন্ন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পারস্যদেশে এক সময়ে প্রবাদবাক্যের মত প্রচারিত হইয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল, ও গ্রীক চিকিৎসক হেপো-ক্রেটস, ও গ্যেলেনের মতানুসরণকারী হইলেও, তিনিই মধ্যযুগের ইয়োরোপের জ্ঞান-গুরু ছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা, মতবাদ পারস্যের জ্যোতির্ব্বিদ-কবি ওমর খৈয়ামের ওপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল। আবু আলি সিনার মৃত্যুর পর ওমর যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার নূতন তথ্য আবিষ্কার দ্বারা পারস্যের পণ্ডিত সমাজকে চমৎকৃত করিতেছিলেন, ওমর যখন নিজ মতবাদ প্রচার দ্বারা সমগ্র দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, তৎকালীন পারস্যের জনসাধারণ ওমর খৈয়ামকে "আবু আলি সিনার অবতার" বলিয়া অভিহিত করিয়া ছিল। ওমর আবু আলি সিনাকে গুরুপদে বরণ করিয়া, তাঁহারই অসমাপ্ত বাণী প্রচার দ্বারা পারস্য দেশে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। আজ আমরা এই প্রবন্ধে ওমর-গুরু আবু আলি সিনার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

আবু আলি সিনা পারস্যের বোখারা শহরে ৩৭৩ হিজরাব্দে (৯৮০ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইবন খালি খান (১) বলেন, দশ বৎসর বয়সের সময় আবু সিনা সমগ্র কোরাণ, সাহিত্য, মুশলিম ধর্ম্মতত্ব, পাটীগণিত, বীজগণিতে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যে এই সুকুমার বয়সেই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করেন। (২) ইহার পর তিনি মিশর দেশীয় এক সুবিখ্যাত চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ইউক্লিও, ও মিশর দেশীয় পণ্ডিত টলেমির গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। সুবিখ্যাত সুফী ইসমাইলের নিকট সুফীধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও

---

(১) ইনি দামস্কাশের অধিবাসী ছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বিদ্বান। ৬০৮ হিঃ অব্দে (১২১১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ৬৮০ হিঃ (১২৮১ খৃঃ) পর্য্যন্ত প্রধান কাজীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কোন কারণে তিনি কর্ম্মচ্যুত হয়েন। কর্ম্মচ্যুত হইবার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি আর বাটীর বাহির হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তিনি সুকবি, জীবনচরিতকার, সম্পাদক, ও ঐতিহাসিক ছিলেন। "ওয়া ফিয়াৎ-উল-ইয়ান" বিখ্যাত চরিতাভিধান। এই বিশ্ব বিখ্যাত চরিতাভিধান খানি প্রাচ্যভাষাবিৎ ফরাশী পণ্ডিত Baran Mc Guekin De Slane কর্ত্তৃক ১৮৪২ খৃঃ লণ্ডনের Oriental Translation Fund-এর জন্য আরবী হইতে ফরাশী ভাষায় অনূদিত হয়। এই অভিধানের একটি ইংরাজী সংস্করণও আছে।

(২) ওয়া ফিয়েৎ-উল-ইয়ান।

অপরাপর বিজ্ঞান শাস্ত্র একজন খ্রীষ্টান চিকিৎসকের নিকট অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়া এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, সতের বৎসর বয়সে সমানদ বংশীয় রাজকুমার মনসুরের চিকিৎসার জন্য রাজপ্রসাদে তাঁহার আহ্বান হইয়াছিল। (১)

রাজকুমার তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে রোগমুক্ত হন এবং আবু আলি সিনার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন। রাজকুমার মনসুর বিদ্যানুরাগী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাঠাগার দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থরাশিতে পূর্ণ ছিল। রাজকুমার আবু আলি সিনার চিকিৎসা নৈপুণ্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে নিজ গৃহ-পাঠাগার ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন। এই অমূল্য পাঠাগার সম্বন্ধে আবু সিনা বলিয়াছেন যে, এই সুবৃহৎ পাঠাগার অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলীতে পূর্ণ। এই সকল অমূল্য গ্রন্থাবলীর নাম পূর্ব্বে অতি অল্প লোকে শুনিয়াছে। আমি ইহার পূর্ব্বে এত মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাবলীপূর্ণ পুস্তকাগার কখনও দেখি নাই। (২)

কিছুকাল পরে দুর্ভাগ্যক্রমে এই অমূল্য পাঠাগারটী হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। রাজকুমারের অনুগ্রহ দৃষ্টি অনেক আমির ওমরাহগণের ঈর্ষানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। যে অশুভ মুহূর্ত্তে রাজ-পাঠাগার অগ্নিদগ্ধ হয়, সেই সময় আবু সিনার শত্রুগণ মহা উৎফুল্ল হইয়া চক্রান্ত করিয়া প্রচার করিল যে, আবু সিনা নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠাগারে অগ্নি সংযোগ করিয়াদিয়াছে। সে পাঠাগারের সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে অপর কোন ব্যক্তি এই পাঠাগার ব্যবহার করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে না পারে, এই আশায় সে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে।

আবু সিনার দ্বারা এইঅপকর্ম্ম সাধিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজকুমার মর্ম্মান্তক দুঃখিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বোখারার সীমানা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার আদেশ দেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি বোখারা ত্যাগ করিয়া খাওয়ারজাম নগরে গমন করেন। কুশাগ্রবুদ্ধি চানক্যের মত পারস্য-কবি শেখ সাদী বলিয়াছেন, বিদ্বান পণ্ডিতগণ সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়েই সম্মানিত ও অভ্যর্থিত হন। এই নগরে পদার্পণ করিবামাত্র তত্রত্য রাজা মামুন্‌ সবিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে আবু আলি সিনাকে রাজ-দরবারে আহ্বান করেন। এই সময়ে মামুনের রাজ-সভা বিদ্বানমণ্ডলীর মিলন-মন্দিররূপে পরিণত হইয়াছিল। মামুন খাওয়ার জামশাহ্‌ নিজে সুপণ্ডিত ও পণ্ডিতের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দার্শনিক আবু খাল মাসইহি, চিকিৎসক আবুল হাসান খাকার, গণিতজ্ঞ আবু নসির আরাক্‌ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। (৩) সুপণ্ডিত আবু সিনা এই বিদ্বান-সম্মেলনে যোগদান করায় যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়।

ভাগ্য বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যাযাবর জীবন যাপন লিখিয়াছেন, তিনি বিদ্বান হইলে কি হইবে, তিনি কোন দেশেই স্থির ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। আবু সিনা খাওয়ারজাম রাজ্যে অধিক দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। যে ঘটনায় তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, নিম্নে সেই ঘটনাটী বিবৃত হইল।

গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের ইতিহাসে লুণ্ঠন হত্যাকারী দস্যু বলিয়া পরিচিত হইলেও স্বদেশে নানা সদগুণবিমণ্ডিত ছিলেন। তিনি যেমন বিদ্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যিক ও বিদ্বানগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন, তেমনি অন্য রাজার রাজ্য হইতে প্রসিদ্ধ বিদ্বানকে ছলে বলে কৌশলে নিজ রাজ-দরবারে আনিতে পশ্চাৎ-পদ ছিলেন না। তাঁহার দরবার-গৃহ বিদ্বানগণের মিলন-

(১) Catalogue of Persian and Arabic manus- cript prepared by Dr. Ethe.
(২) কিতাব-উল্‌ মিলাল্‌ ওয়ান নিহাল্‌।
(৩) চাহার মকালা।

মন্দির ছিল। পারশ্যের মহাভারতকার, পারশ্য কাব্য সাহিত্যের প্রথম কবি-পয়গম্বর মহাকবি ফিদৌসী সুলতান মামুদের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। দশম শতাব্দীতে আবু সিনার তুল্য জ্ঞানী, জ্ঞান বিজ্ঞান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক কেহই ছিলেন না। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সুলতান মামুদ আবু সিনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বরাবরই অন্তরে অন্তরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তাঁহাকে আপনরাজ সভায় পাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা কখনও ফলবতী হয় নাই।

আবু সিনা বুখারার রাজকুমার কর্ত্তৃক অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া মামুন খাওয়ারাজাম শাহের রাজদরবারে আশ্রয় পাইয়াছেন শুনিয়া সুলতান মামুদ আবু আলি সিনাকে সত্বর তাহার রাজসভায় প্রেরণ করিবার জন্য পত্রসহ একজন দূত প্রেরণ করেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই-রূপ :—আমি শুনিয়াছি আপনার রাজসভা সুপণ্ডিতগণের মিলন-মন্দিরে পরিণত হইয়াছে এবং এই সকল সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের সহবাসে আপনি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আমার আদেশ, এই পত্রপাঠ মাত্র বিদ্বান মণ্ডলীকে আমার রাজসভায় প্রেরণ করিবেন। আমি এই সকল বিদ্বানগণকে তাঁহাদের সমুচিত সম্মান সহকারে আশ্রয় প্রদান করিব। (১)

রাজকুমার সুলতান মামুদের আদেশপত্র পাঠ করিয়া সাতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন। খাওয়ারাজাম শাহ সুলতান মামুদের অধীনস্থ রাজা ছিলেন, সুলতান মামুদ ইতি পূর্ব্বে দুইবার তাঁহার রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া সভাপণ্ডিত মণ্ডলীকে ডাকাইয়া তাঁহাদের সম্মুখেই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন এবং ইহাও প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদিগকে প্রেরণ না করিলে রাজ্য রক্ষা করিবার কোন উপায়ই নাই। সুলতান প্রবল পরাক্রমশালী, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিব না। সুলতানের এই পত্রাদেশ আমাকে পালন করিতেই হইবে। এক্ষণে আপনাদিগের অভিমত প্রকাশ করুন।

আল বিরুনী, আবুল হাসান খাকার, এবং আবু নাসর আরাক্ এই তিন জন বিদ্বান সুলতানের উদারতা ও আশ্রিত বাৎসল্যের কথা জানিতেন। ইঁহারা তিনজনে সুলতান মামুদের রাজসভায় যোগদান করিবার সম্মতি প্রদান করেন। আবু আলি সিনা ও আবু স্বাল মাস ইহি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গোপনে পলায়ন করেন। সুলতান মামুদ বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য হইয়া বলপূর্ব্বক খাওয়ারজাম্ রাজ্য অধিকার করেন। যাঁহাকে আপন রাজসভায় পাইবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিতে ছিলেন, সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ আবু আলি সিনাকে না পাইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। আবুসিনা পলাতক শুনিয়া তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা করেন, যিনি আবু আলি সিনাকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার ও রাজ সম্মানে ভূষিত করিবেন।

আবু সিনা খাওয়ারজাম শহর হইতে পলায়ন করিয়া আত্ম গোপন করিয়া বাস করিতে থাকেন।

কুবাসের রাজার এক আত্মীয়কে কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত করেন, রাজ আত্মীয় তদীয় চিকিৎসক আবু আলি সিনাকে রাজদরবারে উপস্থিত করেন। রাজা প্রথম দর্শনেই সুলতান মামুদ প্রেরিত চিত্র হইতে আবু সিনাকে চিনিতে পারেন। তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আবু সিনাকে নিজ দরবারে আশ্রয় দেন। তিনি এই সময়ে কুবাস রাজের মন্ত্রি পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। কুবাস শহরে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ "সীফা" রচনা করেন। কুবাস শহরে তিনি অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। সুলতান

(১) Dr. Sachau's translation of Al. Biruni's chronology of ancient nations.

মামুদের অত্যাচারের ভয়ে অল্পদিন পরেই রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রায় নগরে অবস্থান করেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমান জীবন তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে। (১) মরুভূমি অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ উদরের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ৪২৭ হিঃ অব্দে (১০৩৭খ্রীঃ) হামদান নগরে ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (২)

আবু আলি সিনার গ্রন্থ সংখ্যা আজিও স্থির নিশ্চয় করিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার যতগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একশত চল্লিশ, গণিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে দশ খানি, দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে পনেরখানি, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাঁচখানি, কুড়িখণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ, ইহা ব্যতীত সুপণ্ডিত আরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী গ্রীক হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

উপরি লিখিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী ব্যতীত আবুসিনা পারস্য ও আরবী ভাষায় বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করেন। প্রাচ্যভাষাবিৎ জর্ম্মণ পণ্ডিত ডাক্তার এথ্ (Dr Ethe) অসামান্য শ্রম স্বীকার ও গবেষণা করিয়া পারস্য কবিতা সংগ্রহ করিয়া জর্ম্মণ ভাষার অনুবাদ ও সম্পাদন করিয়াছেন।

আবুসিনার পারস্য ও আরব্য ভাষায় লিখিত কবিতা মূর্ত্তিমান "বিদ্রোহ"। এই বিদ্রোহ—অভিযান দেশাচার, সুফীধর্ম্ম, ভণ্ডামী, গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে। আবুসিনা অত্যন্ত পিয়ালা বিলাসী ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা সুরা, সুরাপাত্র ও নারীর প্রশংসাবাদে পূর্ণ।

(১) চাহার মকালা।

(২) ইবন উল আথর।

# গজল-গান

নজরুল ইস্‌লাম

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরনে চললো গোরী।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছল ছল জল-লহরী ॥

দিবা চ'লে যায় বলাকা-পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়।
কেঁদে চখাচখী মাগিছে বিদায়,
বারোঁয়ার সুরে ঝুরে বাঁশরী ॥

সাঁজ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি চিকুরে।
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে,
দুলে লটপট লতা-কবরী ॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী
'চ'লো জল নিতে যাবিলো যদি!'
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী ॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে।
কা'রে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি-জলে ঘড়া গাগরী ॥

ওগো বে-দরদী, ও-রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে?
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি ॥

# বীরবল

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবার দিল্লী গিয়ে জেনে এসেছেন যে অনেকে প্রমথ চৌধুরীকে জানেন না, কিন্তু 'বীরবলকে' চেনেন। এঁরা তত্ত্বদর্শী লোক, ঠিক জিনিষকেই চিনেছেন। কারণ 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মবেশ নয়, আত্মপ্রকাশ।

আকবরের সভার ঐতিহাসিক বীরবল লোকটি কে এবং কেমন ছিলেন শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় তার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। যাঁরা ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক নন্ তাঁরা এই গবেষণার ফলের জন্য নিশ্চয় উৎসুক থাকবেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা-সাহিত্য-সভার 'বীরবলটির' একটু পরিচয় নেওয়া যাক্।

কবি সংসারকে বলেছেন নাট্যমঞ্চ, আর মানুষকে তার অভিনেতা; কিন্তু এ অভিনয়ে যারা অভিনেতা, তারাই আবার দর্শক। তবে সকল অভিনেতা দর্শক নয়। অনেকেরই নিজের অভিনয় থেকে মুখ তুলে, কেবল দর্শক হিসাবে, পরের অভিনয় চেয়ে দেখার ক্ষমতা নেই। যাদের আছে তাদের সকলের চোখে এ অভিনয়ের এক রূপ নয়, সকলের মনে এ নাটকের এক রস নয়। 'বীরবল' হচ্ছে এই নাট্যাভিনয়ের দর্শক। অর্থাৎ তার অভিনয়ের অংশটা অপ্রধান এবং প্রচ্ছন্ন, দর্শকের অংশটাই প্রধান এবং প্রকট। এবং এ নাটক 'বীরবলের' মনে যে রসের সঞ্চার করে সেটি নবরসের অতিরিক্ত এক দশম রস, যাকে বলা যেতে পারে 'মনন রস।' মানুষের মতামত, বিশ্বাস অবিশ্বাস, কর্ম্ম অকর্ম্ম, কাউকে মাতায়, কাউকে রাগায়, কাউকে কাঁদায়, কাউকে বা হাসায়। 'বীরবলের' মনের উপর এদের 'ভাব-ফল', মনস্তত্ত্ববিদেরা যাকে বলেন affect, এত সহজ ও সরল নয়। "মস্তিষ্কের বকযন্ত্রে" অন্ততঃ দুবার না চুঁইয়ে কোনও জিনিষ 'বীরবলের' 'ভাবের' পথে ছাড়া পায় না। আর এই কর্ম্মকুশল যন্ত্রটিকে চুঁইয়ে নেবার ফলে অনেক সময় দেখা যায় খুব প্রকাণ্ড চেহারার জিনিষ থেকে গাঁদ ছাড়া এক ফোঁটাও সার বেরুল না। অথবা যেটুকু বেরুল তা মানুষকে মাতান দূরের কথা, হাসাবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

এই 'বকযন্ত্রটি' বাঙ্গলা-সাহিত্যের 'ল্যাবরেটারিতে' 'বীরবলের' একটা প্রধান দান। এর কাজ ভাব, চিন্তা, ভাষা—সব জিনিষকে চুঁইয়ে নেওয়া; যাতে এদের ভার বাদ দিয়ে সার বের হয়। 'বীরবল' যে সংস্কৃত ভঙ্গীর গুরুভার থেকে বাঙ্গলার সাহিত্যের ভাষাকে মুক্তি দিতে শিখিয়েছেন, সেটাও এই 'বকযন্ত্রের' কাজ। বীরবলের নিজের কথায়, "ভাষার এখন শানিয়ে ধার বা'র করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। * * * * ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে' এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।" ('কথার কথা')। ঠিক এই কারণেই যে চিন্তা 'চিন্তাশীল', অর্থাৎ যার ধারের চেয়ে ভার বেশী, আলোর চেয়ে আয়োজন বেশী—বীরবলের মন তার উপর বিমুখ। "রসিকতা ছাড়লে আমাকে 'চিন্তাশীল' লেখক হ'তে

হবে—অর্থাৎ অতি গম্ভীরভাবে অতি সাধুভাষায় বার বার হয়কে নয় এবং নয়কে হয় বল্‌তে হবে। কারণ, যা প্রত্যক্ষ তাকেই যদি সত্য বলি,—তাহ'লে আর গবেষণার কি পরিচয় দিলুম? কিন্তু আমার পক্ষে ওরূপ করা সহজ নয়। ভগবান্, আমার বিশ্বাস মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখ্‌বার জন্য,—তাতে ঠুলি পর্‌বার জন্য নয়। সে ঠুলির নাম দর্শন দিলেও তা অগ্রাহ্য।" ('বীরবলের চিঠি।') চিন্তা ও ভাষায় 'বীরবলের' মনঃপুত আদর্শ কি তা তিনি 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে' খুলে বলেছেন। 'এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে' আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়,—তাহ'লে সে জিনিষের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হ'লেও চলে;—কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকেরা এই সত্যটি মনে রাখলে, গল্প স্বল্প হ'য়ে আস্‌বে, শোক শ্লোকরূপ ধারণ কর্‌বে, বিজ্ঞান বামন রূপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে' থাক্‌বে, এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে।"

মোগল আমলের বীরবল তাঁর হিন্দু-সংস্কার ত্যাগ করেন নি। সেখানের মৌলবীরা লিখে গেছেন আকবরের যা কিছু অ-মোস্‌লেম্ কার্য্যকলাপ তার মূলে নাকি এই ব্রাহ্মণসন্তানটি ছিলেন। বৃটিশ-আমলের 'বীরবলের' মধ্যেও তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষের সংস্কারই কাজ কর্‌ছে—যাঁরা গল্পকে স্বল্প না কর্‌লেও, আর সব জিনিষকেই হয় সূত্রে নয় শ্লোকে গেঁথেছেন।

যে কারণে 'বীরবল' নিজের ও পরের চোখে ঠুলি পরাবার বিরোধী, ঠিক সেই কারণেই বুদ্ধিগম্য জিনিসকে ভাবের রঙীন্ চোখে দেখ্‌তে 'বীরবল' নারাজ। 'বীরবল' চান সব জিনিষকে বুদ্ধির শাদা চোখে দেখ্‌তে। ফলে তাঁর দেখার সঙ্গে অনেকেরই দেখার মিল হয় না। কারণ শাদা চোখে জিনিস দেখার ক্ষমতা অতি আয়াস-লব্ধ শক্তি। চোখের পাছে মন আছে ব'লেই চোখ দেখে। আর মনকে দরকার মত ভাবের রঙ্ থেকে মুক্ত করা সকলের সাধ্য নয়। এবং সকলে তা ইচ্ছাও করে না। সেইজন্য স্নেহলতার আত্মঘাতে যখন সকলের মন করুণ রসে সিক্ত হয়ে নিজেদের সহৃদয়তায় আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগ কর্‌ছে, তখন 'বীরবল' লিখে বস্‌লেন, "আজ ঝোঁকের মাথায় মনে মনে যিনি যতই কঠিন পণ করুন না কেন, তার একটিও টিক্‌বে না,—থাক্‌বে শুধু বরপণ"। কথা সত্য। কিন্তু নেশা যে ভেঙ্গে দেয় তার উপর রাগও স্বাভাবিক। তাই বীরবলকে বল্‌তে হয়েছে, "আমি চাই অপরের চোখের ঠুলি খুলে দিতে; শুধু শিং বাঁকানোর ভয়ে নিরস্ত হই। ফলে দাঁড়ালো এই যে, রসিকতা করা নিরাপদ নয়, আর সত্য কথা বলাতে বিপদ আছে।"

'বীরবলের' এই রসিকতা জিনিসটাই সাধারণের নিকট সব চেয়ে পরিচিত। একেই বলা হয় 'বীরবলী ঢঙ্'। কিন্তু এ রসিকতার মূল হাস্য রস নয়, এর মূল যাকে বলেছি 'মনন-রস'। অর্থাৎ এ ঢঙ্ ভাবের ঢঙ নয়, বুদ্ধিকে খেলাবার ঢঙ্। বীরবলের রচনা মস্তিষ্ককে জাগিয়ে তোলা ও জাগিয়ে রাখার জন্য 'ইলেক্‌ট্রিক শকের' তার,—তার রসিকতা হচ্ছে ওরই 'স্পার্ক'। সুতরাং যারা বিশুদ্ধ হাস্য রস চান, তাদের 'বীরবলের' কাছে যাওয়া বৃথা। আর যারা বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করতে চান তারা যেন ওঢঙের কাছ দিয়েও না হাঁটেন। এবং মোটের উপর এ ঢঙ্‌কে নকলের চেষ্টা না করাই ভাল। 'শক' দেবার ক্ষমতা নেই, খালি 'স্পার্ক' বের হয় এরকমের ব্যাটারি শিশু ছাড়া আর কারু কাছে আদর পাবে না। বীরবলের নিজের কথা হচ্ছে, "পরের ঢঙের নকল করে শুধু সঙ"।

সব জিনিসকে বুদ্ধির কলে নিঙ্‌ড়ে নিতে হলে তার দাম দিতে হয়। 'বীরবলকেও' দিতে হয়েছে। এই নিঙ্‌ড়ে নেওয়ার ফলে অনেক জিনিসের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শুক্‌নো হয়ে পড়ার একটা আশঙ্কা থাকে। কোনও কোনও জিনিস আছে রঙীন আলো ছাড়া যার স্বরূপ ঠিক দেখা যায় না। স্বাভাবিক ঝোঁকে 'বীরবল' সেখানেও কেবল শাদা আলোতেই দেখ্‌তে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বীরবলের' বাঙ্গলা দেশের "এক ঢালা সবুজবর্ণের" বর্ণনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে:—

"সবুজ, বাঙ্গলার শুধু দেশজোড়া রং নয়,—বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালঙ্কারা হ'য়ে দেখা দেয় না, বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হ'য়ে শরতের পূজার তসর ধারণ করে' আসে না। শীতে বিধবার মত সাদা শাড়ীও পরে না। মাধব হতে মধু পর্য্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়ি কোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণ বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণ গ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী, প্রকৃতির ওসকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যভিচারী ভাব-সকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গ দেশের এই অখণ্ড-হরিৎ স্থায়ী-ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।" ('সবুজ পত্র')।)

লেখক মাত্রেরই স্বীকার করতে হবে এ লেখা হাত থেকে বের করা অতি কঠিন কাজ। তবুও এ বর্ণনা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে' মনকে সবুজ করে' তোলে না; মস্তিষ্কে প্রবেশ করে' এর চিন্তার পারিপাট্য ও রচনার কৌশল সম্বন্ধে মনকে সচেতন করে। অথচ জিনিসটি হচ্ছে প্রধানতঃ ভাবের বিষয়। মনে সবুজের 'ভাব' ধরাতে না পারলে এ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। কিন্তু সূর্য্যের আলোতে মখ্‌মলের মসৃণতা নেই কেন এ আপশোস বৃথা।

দর্শন শাস্ত্রে বলে সত্বগুণের লক্ষণ হচ্ছে যে তা লঘু ও প্রকাশক। বাঙ্গলা-সাহিত্যকে এই সত্বগুণের ভক্ত করা 'বীরবলের' সব চেয়ে বড় কাজ।

# মনের পাগল

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মনের পাগল মানুষের মনে
কি মাতনে মাতে হায়,
প্রাণের প্রহরী মিছা মরে ফিরে'—
নাগাল তাহে না পায়।
সুখের শয়ন ছাড়িয়া হেলায়
কোথায় বুকের ভাঙনে খেলায়,
দুখের ঝটিকা হু-হু যায় ব'য়ে—
শোকনিধি গরজায়!

মনের পাগল মানুষের মনে
কি খেলা কি জানি খেলে,
ঘরের মণিরে আনিয়া বাহিরে
ধূলাতে ছড়িয়ে ফেলে।
মশানের মাটি, শ্মশানের ছাই,
কত না যতনে ব'য়ে আনে তাই,
ফুল-হার ফেলি' কণ্টক-মালা
হয় ত' সে পরে' এলে!

মনের পাগল মানুষের মনে
জেগে' আছে নিশিদিন,
বিরাম-বিহীন চির দিবারাতি
সু-চির নিদ্রা-হীন।
ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে হাতের বাতিরে,
আঁধার বিপথে কাটায় রাতি রে,
ফাগুনের বনে চাহে না ফিরিয়া—
শিশিরে শিশির-লীন!

মনের পাগল—অথচ মানুষ
মন তার নাহি পায়,
কি কামনা তার, কেন মাথা কুটে'
মরে পাষাণের পায়...
সোহাগে সহসা কাঁদিয়া সে উঠে,
অনাদরে তার মুখে হাসি ফুটে,
সুধার পাত্র ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে
মদিরায় মেতে যায়!

মনের পাগল—মানুষ জানে না
কোন্ সে অশুভ খণে
বনের পাগল খোলা পেয়ে দ্বার
এল মানুষের মনে।
বনের পাগল—সে-ও পোষ মানে,
সে-ও উঠে-বসে শিকলের টানে,
শিকল-আগল এ-যে একাকার
করে' ফেলে একসনে!

---

উপন্যাস

## তৃতীয় ভাগ

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

( ৯ )

হাবড়া ষ্টেশনে গাড়ি খুব ভোরে পৌঁছেছিল! সেই সকালেই দেখি, বদন এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বদন, কখন আমার তার পেয়েছিলে?

সাড়ে ন'টার তোপের একটু আগে।

কোথায় এখন উঠি বল ত? চল, তোমাদের বাড়ীতে।

বদন মাথা নেড়ে বল্লে, নাঃ।

তবে?

চলতো দেখি কোথায় তোমায় নিয়ে যাই। টিনের তোরঙ্গটা দেখে বল্লে, একি! তিনিও এসেছেন?

আমি হেসে ফেল্লুম, আস্‌ছিলেন, পথে একটা ষ্টেশনে থেকে গেছেন।

মারামারি ক'রে গেরেপ্‌তার হয়েছে বুঝি?

নাহে না, নেমে প'ড়ে গাড়ি ধরতে পারে নি আর!

সে বল্লে, তাই রক্ষে!

হাবড়ার পুল খোলা! জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল আটটার আগে বন্ধ হবে না।

বদন বল্লে, চল ফেরি ষ্টীমারে পেরিয়ে যাওয়া যাক, কে বাপু, দু'ঘণ্টা এখেনে ব'সে ভেরাণ্ডা ভাজে?

বল্লুম, তাই ঠিক হবে চলো।

কি ভিড় ফেরি ঘাটে! সবাই যেতে চায় এগিয়ে। সাম্‌নে রুদ্রমূর্ত্তিতে সার্জ্জেণ্ট দাঁড়িয়ে। এক পাশে গুটি কয়েক সায়েব মেম অক্ষত-শরীরে নিরীহ যাত্রীদের ওপর চাবুক চালান দেখে এ ওর গায়ে হেসে ঢলে পড়ছে! পিছন থেকে ঠেলার ওপর ঠেলা, সাম্‌নে চলছে—সপাং সপাং!

রাগে মানুষের আগা পাস্তলা জ্বালা করে ওঠে!

একরাশ লোক নিয়ে ওপার থেকে ফেরি আস্‌চে, যারা আস্‌চে তারা সবাই চায় নিমেষে নেমে' চলে যেতে—আর এরাও চায় এক নিশ্বাসে উঠে পড়তে! সে একটা ভীষণ হুড়োমুড়ি-কাণ্ড!

হঠাৎ চীৎকার উঠ্‌লো,—গেল, গেল, গেল...ফিরে দেখি জেটির ওপর থেকে এক বৃদ্ধা প'ড়ে যাচ্ছে! পলকে ফেরিখানা এসে চেপে দেয় আর কি আবার, গেল! গেল গেল······

অগ্র পশ্চাৎ, জীবন মৃত্যু কোন কথাই মনে এলো না! শুধু চোখের সাম্‌নে এমন করে একজনকে পিষে ম'রে যেতে দেখা—সত্যই অসহ্য, ঝাঁপিয়ে প'ড়লুম জলের ওপর!

তারপর, সব অন্ধকার!

* * *

* *

চোখ চেয়ে দেখলাম, চির পরিচিত সেই ঘর। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সদা-প্রফুল্ল আমাদের প্রিন্‌সিপ্যাল সায়েব!

কেমন আছ, কেমন বোধ ক'রছ, মাই-বয়?

ঘাড় নেড়ে জানালুম, ভাল।

তারপর মাথার ওপর ফুলের মত নরম কচি দুটি হাতের স্পর্শ,—চোখ তুলে চেয়ে মনে হলো, একি! পৃথিবী ছাড়া আর কোন জয়গা নাকি!

পাস্তলায় বদন একখানি চেয়ারে;—মুখখানি তার জয়োল্লাসের হাসিতে ভরা।

সায়েব শিশ্‌ দিতে দিতে চ'লে গেলেন।

বল্লুম বদন খুব ভাল জায়গায় এনে তুলেছ দেখচি;—খাস্‌ আমাদের মেডিকেল কলেজে?

হেসে বদন বল্লে, যেমন তোমার গোঁয়ার্ত্তুমি!

পাশ ফিরে শুতে শুতে হাতখানি ধরে একটি ছোট্ট চাপ দিয়ে—মনে হলো, এখানেও তুমি . . . আঃ! আর কোন ভাবনা নেই . . .

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেই বুড়ীটির কথা।

বদন, বদন, সেই বুড়ী কেমন আছে?

বদন উত্তর না দিয়ে কেমন যেন করতে লাগ্‌লো। তাই নীলমণি বল্লে, সে ভালই আছে, তাকে—আমি দেখে-দেখে আস্‌চি। মেয়ে ওয়ার্ডে আছে কিনা—বদন সেখানে যেতে পারে না।

বেঁচে আছে তো?

তার কাল বিকেলেই জ্ঞান হয়েছে। তোমার চেয়ে সে অনেক ভাল আছে।—কিছু কি খাবে?

চারটি শুক্‌তুনি ভাত দিতে পার?

নীলমণি বদনকে বল্লে, বদন, যাওনা ভাই, একবার রমেশবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে এসো না।

বদন চ'লে গেল।

নীলমণি!

কি?

কিছু না, শুধু নীলমণি! বল্‌তে ভালো লাগে তাই বলি নীলমণি!

মাথার শিয়রে টেবিলের উপর ঘড়ি টিক্‌ টিক্‌ করচে; চোখ বুজে শুন্‌লুম, ঘড়ি বলচে, নীল্‌মণি; নীল্‌মণি; নীলমণি! বুকের মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি; নীল্‌মণি, নীল্‌মণি, নীল্‌মণি!

মনে হলো এত সুখে মানুষ কি মরে? দুঃখ হলো, আহা! এমন সময়ও কেন মৃত্যু আসে না!

রমেশ নিজে এলো, হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, কি হে মাই-বয়, একেবারে শুক্‌তুনিতে প্রমোশন?

মাই-বয় আবার কিহে?

রমেশ হাস্‌তে লাগ্‌লো—সে অনেক কথা, সেরে ওঠো সব শুন্‌তে পাবে। . . . আচ্ছা আমি সায়েবকে জিজ্ঞাসা করে আসি। . . . বাপ্‌রে পান থেকে চুণ খসার যো আছে? কি তম্বি গম্বি!

রমেশ তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বল্লুম, ব্যাপার কি বদন?

বদন বল্লে, ওই তোমাদের বড় সায়েব গো, কাল সমস্ত রাত ধরে যাওয়া-আসা ক'রেচে; তার ভয়ে ত' সবাই তটস্থ!

নীলমণি বল্লে, কি একটা ওষুধ দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই রমেশবাবুকে খুব ব'কেছিলেন সায়েব। সেই কথাই উনি বল্‌ছিলেন।

রমেশ আবার হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্লে, সায়েব বলে, He can go. কিন্তু এই হাঁসপাতালে তোমায় শুক্‌তুনি রেঁধে দেয় কে ?···বৌদিকে খবর দেব নাকি ?

হাসি এলো। বল্লুম, পারুবে কি ?

রমেশ উৎসাহ ভরে বল্লে, নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিকানা দাও ...এখুনি যাচ্ছি।

বল্লুম, তাই তো রমেশ, ঠিকানাটা মনে নেই।

তবে ত দেখচি কঠিন।

বল্লুম, একেবারে।

বদন একটু ব্যস্ত হ'য়ে রমেশকে বল্লে, ভাবচেন কেন ? দেখ্‌লেন না, দিদি আন্‌তে চ'লে গেলেন ?

সে কতদূরে ?

কাছেই, ভবানী দত্তর গলি।

রমেশ হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যেতে যেতে বল্লে, তবে ত' তাড়াতাড়ি আস্‌তে হচ্চে কাজ সেরে। না জানি কার মুখ দেখে উঠেছি !— দিদির কি আর আমার কথাটা মনে থাকবে না !

সোৎসাহে বল্লুম, রমেশ ভাই সে বেশ হবে, সত্যি তুমি চট্ ক'রে তৈরী হয়ে এসো।

সে কথা আর বল্‌তে ? ব'লে রমেশ চলে গেল।

বদন কেমন উস্‌খুস্ করে ; শেষ বল্লে, আমি একবার ধা ক'রে ব'লে আসি গিয়ে রমেশের কথা ; নইলে রাগ করবে ভারি।

তা যাওনা বদন।

তোমায় একলা ফেলে ?

তাতে কি ? আমি কি জলে প'ড়ে আছি ?...আরে যাওনা তুমি !

বোক্‌বে।

না, না, কিছু বলবে না ; আমি ভার নিচ্চি—যাও তুমি।

বদন ইতস্ততঃ ক'রে শেষে গেল।

বোধ করি যাবার সময় রমেশকে ব'লে গিয়েছিল। একটু পরেই রমেশ এলো।

দাদা, ঐ দিদিটি কে ?

বোধ করি মুখে একটু অপরাধীর হাসি প্রকাশ পেয়েছিল, বল্লুম, বলা শক্ত ভাই।

রমেশ হেসে বল্লে, আমিও যেন কেমন-কেমন আন্দাজ করছিলুম...

হঠাৎ রমেশের বাগ্মিতা জেগে উঠ্‌লো, সে মোটা গলায় আবৃত্তি করতে সুরু ক'রে দিলে ;

Oh ! Woman, when pain and anguish···

বল্লুম, ভাই রক্ষা কর। ঐ ত, তোমাদের রোগ। এত তাড়াহুড়ো ক'রে একটা কিছু নাই বা মনে করলে ? দিদি দিদিই, আমি আমিই। এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়, রমেশ ?

চটুল হাসি হেসে রমেশ বল্লে, তার চেয়ে বেশী চায় মানুষে।

বল্লুম, তাই মরে শেষকালে কেঁদে !···

বদন ফিরে এলো।

বদন বল্লে, উঃ কি খুশী যে হ'লো···কিন্তু বকুনি দিতেও ছাড়েনি। যখন বল্লুম, রমেশ বাবুকে রেখে এসেছি— তখন নিস্তার ; মুখে হাসি ফুটলো !

রমেশ 'থ্রি চিয়ার্স' ব'লে ঘর থেকে চলে গেল।

বদন।

কি ?

তুমি নীলমণিকে খুব ভালবাস, না ?

বদন বল্লে, বাসবো না ? হাজার হতভাগাই হই, সে-দিনের কথা এ জীবনে কি ভুলতে পারি ?

হেসে বল্লুম, সে আবার কোন্ দিন হে ?

যে দিন, সে আমার প্রাণ দিয়েছিল।

বটে ! খুব তো তুমি ? আমি তোমায় বাঁচালুম, ওষুধ দিয়ে—আর নাম হলো কিনা নীলমণির !

অপ্রস্তুত হ'য়ে বদন বল্লে, না না, তুমিও, তোমরা দুজনেই—তুমি ত' ডাক্তার।......

তবুও ভাল। আমার কথাটা একেবারে ভোল নি! তোমার দোষ নেই বদন, পুরুষ মাত্রেই মেয়েদের প্রতি এই রকম পক্ষপাত দেখিয়ে থাকে……

কাল্পনিক রাগ দেখিয়ে বদন বল্লে, যাও তুমি ভারি দুষ্টু।

হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, ব'সো না বদন, একটু গল্প-স্বল্প করা যাক্।

না, ব'লে ব'সে প'ড়ে সে বল্লে, কিন্তু তুমি যা তা কথা বল্‌তে পাবেনা, কিন্তু ব'লে দি'চ্চি।

তুমিও না হয় একটু যা-তা কথা বল!

সে বল্লে, আচ্ছা তবে বলি, দেখ, পুরীতে আমার ঠিক মনে হ'য়েছিল যে দিদির সঙ্গে তোমার নিশ্চয় বিয়ে হবে; কিন্তু অবাক হয়ে গেলুম শুনে যে তোমার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে গেল।……আর বোধ হয়, সেই রাগেই দিদিরা হঠাৎ এখানে চ'লে এলো।

তারপর?

তারপর আর কি, এখন ত' সে কোথায় প'ড়তে চলে যাচ্চে।

সেকি? আমি ত' কিছুই জানিনে!

বদন বল্লে, দিদি কি তোমায় সব কথা ঠিক ক'রে বল্‌বে?……বুড়িটা ত' মরে গেছে—সে তোমায় বল্লে, ভাল আছে।……কিন্তু দেখো ভাই, আমি ব'লে ফেল্লুম। আমাকে মানা ক'রে দিয়েছিল। শেষকালে ব'লে দিয়ে আমাকে আবার বকুনি খাইও না।

হাস্‌লুম, আচ্ছা বদন, তুমি ওকে অত ভয় কর কেন?

ক'রবো না?—কি মানুষ বলত?

ভারি! ব'লে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে রইলুম।

মনে হলো, বুকের মধ্যে নিশ্বাসের আকাশটা একেবারে খালি হ'য়ে গেছে—তাতে আর একটুও বাতাস নেই, দম বুঝি আর প'ড়বে না!

নীলমণি ঘরে ঢুকে বল্লে, কৈ বদন, রমেশবাবু কৈ?

এই যে তাঁকে ডাকৃচি, ব'লে বদন চ'লে গেল।

সে আমার কাছে এসে বল্লে, এত যে গম্ভীর? রাগ হয়েছে? বড্ডো দেরি করেছি, না?

কোন রকমে অশ্রু গোপন ক'রে হাসবার চেষ্টা করলুম!

১০

ভবানীদত্তর গলির একখানা বাড়ীতে সন্ধ্যা নাগাদ গিয়ে উঠলুম।

তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার কোন আগ্রহ কিন্তু নীলমণি প্রকাশ করেনি। বিকেলে এলেন মাসীমা। তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। যেতেই হবে, অন্ততঃ দু-চার দিনের জন্য না-হয়।

যুক্তিকে ছাড়িয়ে যখন জেদ উঠে, বিশেষ ক'রে যাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা যায় তাঁর, তখন আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন আর উপায় কি?

বাড়ীখানি ছোট হলেও সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দক্ষিণ দিক একেবারে খোলা। আমি যে ঘরে স্থান পেলুম সেটি ছিল কর্ত্তার। তাঁর অভাবের পর এ ঘর আর বড় কেউ ব্যবহার করে না। তাই ব'লে একটুও অযত্ন রক্ষিত নয়। কর্ত্তার একটি বড় তৈল-চিত্র ঘরে ঢুক্‌তেই সামনে। সৌম্য সহাস্য মুখ-খানি দেখেই মনে হয়, চোখ দুটি যেন কথা কয়ে ব'লচে, এসো, এসো!

বদন সঙ্গে এসেছিল, খানিক ব'সে বল্লে, একটু ঘুরে আসি গে।

ফিরে আস্‌বে ত?

বাঃ রে, আস্‌বো না ত কি? মাসীমা রাত্রে খেতে বলেছেন। দরকার হয় রাত্তিরে থাক্‌বো।

বেশ তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, একটু ঘুরে এসো ভাই।

বদন বার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তড়্‌তড়্‌ ক'রে নেমে গেল, তার পায়ের শব্দ শেষ সিঁড়ি পর্য্যন্ত শোনা গেল।

টেবিলের উপর খানকয়েক বই ছিল, তার মধ্যে একখানা তুলে নিয়ে দেখলাম সেখানি এক ইংরেজ বিদুষীর

লেখা। নামটা মনে নেই; কিন্তু বইখানির বিষয়টি বড় গম্ভীর! পড়লেই মানুষকে একান্ত চিন্তাশীল ক'রে দেয়; জীবন-সংগ্রামে নারীর স্থান কোথায়—তাই নির্দ্দেশ করা বোধকরি গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য।

বইখানি হাতে নিয়ে সোজা ক'রে ধরতেই একটা পাতা খুলে গেল। সেই পাতের কয়েকটা লাইনের পাশে নীল পেনসিলের মোটা দাগ। দাগ দেখে সেই জায়গাটা পড়ে নিতে মনটা স্বতঃই ধাবিত হলো।

বিদুষী বলছেন—স্বীকার করতে হবে নানা কারণে নারী পুরুষের চেয়ে দুর্ব্বল এবং অক্ষম। সময়ে সময়ে তাই তাকে পুরুষের সাহায্য নিয়ে জীবন যাত্রা চালাতে হয়েছে!

অক্ষমতার প্রকাণ্ড দোষ যে, তাকে ভিতর দিক থেকে পূরণ না ক'রে যদি বাইরের শক্তি দিয়ে পূরণ করা যায় ত' তার গহ্বর বেড়েই যেতে থাকে।

বিশ্ব-সংসারে নারীর হয়েছে সেই দশা! পুরুষের সাহায্য নিতে নিতে এখন সে সম্পূর্ণ তার করতলগত হ'য়ে পড়েছে। সত্যকথা বলতে গেলে, প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষ নারীর মালিক কিম্বা প্রভু! আবার এমন দেশে এমন মানুষ আছে যারা নারীর আত্মা ব'লে যে কিছু আছে তাও স্বীকার করে না! . . .

এতদিন নারী এই বশ্যতা স্বীকার ক'রে এসেছে কিন্তু আজ যেন তাতে একটা দ্বিধা আসার উপক্রম হয়েছে! নারীর মনে সন্দেহ জাগ্ছে, তার মনে স্বতই একটা প্রশ্ন উঠ্ছে—সমাজের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার ভেদে যে পরস্পরের সংস্থান সেটা কি? যা দাঁড়িয়েছে তাই কি চরম? তার কোন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে না?

নারীর প্রবৃত্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর সাড়া দিতে আরম্ভ ক'রেছে। কারুর মনে হ'চ্ছে—যা চলচে তাই বা ঠিক; কেউ মনে করচে'—হয় ত তার কোথাও একটা গলদ আছে; আবার কেউ কেউ মনে করে, এর অনেক খানি পুরুষের স্বার্থপরতা আর জবরদস্তির ফল!

শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার এবং প্রবৃত্তির বিভিন্নতা আছে; তাই মতের ভেদও আছে। হয়ত বা এতদিন যে মতবাদ মেনে কাজ চ'লেছে—আর একদিন তার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে।

প্রতি সমাজেই ত' এমন হচ্চে। চিরদিনই হয়ত' মতামতের বদল চল্বে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়ার একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। নারীর দুর্ব্বলতার কি কোন প্রতিবিধান নেই? তার ব্যবস্থা কি জগতের নারী-সমাজ ক'রে উঠ্তে পারে না? নারী কি কোনদিন আত্ম-নির্ভর, স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে' তার নিজের দুই পায়ে স্বাধীন হয়ে দাঁড়াতে পার্বে না? * *

* * * * * *

ইত্যাদি।

বইখানি উল্টে পাল্টে দেখ্লুম যে সে, খানি যে বারবার ক'রে পড়া হয়েছে, তার বহু-চিহ্ন তার অবয়বে অভ্রান্তরূপে অঙ্কিত আছে।

এমন সময়, পিছন থেকে হঠাৎ কে এসে বইখানি কেড়ে নিলে। ফিরে দেখি, নীলমণি!

নীলমণি তর্জ্জনি আস্ফালন ক'রে বল্লে, হে পুরুষ, তুমি আজ পীড়িত ব'লেই নারীর শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ ক'রেছ; কিন্তু তোমার স্বভাব কোথায় যাবে? তুমি এখানেও এসে তোমার প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছ! তোমার একি জুলুম?

বল্লুম, বাঃ এ যে অনেকটা লেক্‌চারের মত শোনায় নীলমণি!

সে বল্লে, লেক্‌চার হ'তে যাবে কেন? এই আমাদের অন্তরের সত্যবাণী। এ কথা শোনার ধৈর্য্য এবং অভ্যাস আজ পুরুষের নেই; কিন্তু দিন আগত ঐ!

বল্লুম, তাতো বুঝেছি যে, দিন আগত, আরো ঠিক ক'রে বল্লে বল্‌তে হয়, পুরুষের রাত আগত ঐ! কিন্তু বুঝি না, পুরুষের এখানে জুলুমটা হলো কোথায়?

নীলমণি হেসে বল্লে, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে আমার কথা প্রত্যাহার ক'রে, অপাত্রে দানের অবিবেচনার জন্য ক্ষমা চাই!

আচ্ছা ক্ষমা ক'রলুম; কিন্তু বল; সত্যি, লক্ষ্মীটি আমার!

ওতে আর আমরা ভুলি না মশাই, নীলমণি বল্লে, ওকে বলে চাটু; ওটাও তোমাদের একটা বিশেষ বিদ্যা! ওদিয়ে পুরুষ কার্য্য-সিদ্ধি করে।

ব্যাপার কি নীলমণি? অকস্মাৎ তুমি এমন যুদ্ধ-ঘোষণা কর্‌লে কেন?

আমি? যুদ্ধ-ঘোষণা করেছি?...যুগ-যুগ ধরে এই যুদ্ধ চ'লে আস্‌চে; কিন্তু তোমরা এত সবল, এত নিশ্চিন্ত যে তা কানেও তোল না; আর তার কোন দরকার এ পর্য্যন্ত তোমরা বোধ করনি!...কিন্তু একদিন কান দিতে হবে!...দিন আগত ঐ!

বইখানি যথাস্থানে রেখে দিয়ে বল্লে, জান বেদে মেয়েদের অধিকার নেই?

জানি।

এ কথা মান?

বোধ হয় না।

আচ্ছা, কেন মানা আছে বলতে পারো?

বোধ করি পারি, নীলমণি; বেদের সত্যে নারীর অধিকার নেই—এ বিশ্বাস নিষেধকর্ত্তার ছিল।

বেশ, তবে আমিও বলি, এই বইখানি আমাদের নব-বেদ। এতে পুরুষের অধিকার নেই।...তাই তোমারও নেই। তোমার ওখানি পড়া অনধিকার-চর্চ্চা হয়েছে—ওকেই আজকালকার কথায় বলে জুলুম!

বুঝেছি। কিন্তু বইখানি যতটুকু প'ড়েছি তাতে ত' পুরুষের পক্ষে আপত্তি করার কিছুই নেই। দুর্ব্বলকে সবল, অক্ষমকে সক্ষম হ'তে উপদেশ ত' খুব ভাল কথা!

নীলমণি, মৃদু হেসে বল্লে, আছে, সব বইটা পড়লে দেখ্‌তে যে পুরুষের বিরুদ্ধে ওতে ঘোর ষড়যন্ত্র, প্রচণ্ড চক্রান্ত আছে।

বটে! দাম দিলে ত' সবাই ওটি কিনে পড়তে পারে।

না, সে পথ বন্ধ, ও বই পুরুষকে বিক্রী করা হয় না। কোন মেয়ে পুরুষকে ওটা পড়তে দিতে পারে না।

নীলমণির গাম্ভীর্য্য দেখে আমি হাস্‌তে লাগ্‌লুম; বল্লুম, হয়েছে, এখন থামাও তোমার পাগলামি!

নীলমণি বল্লে, এটাও তোমাদের চাতুরীর অন্তর্গত, যখন আর পেরে ওঠনা তখন বল ছেলেমানুষি, পাগলামি!...

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বল্লে, একটা কিছু মুরুব্বিয়ানার কথা বলা ত' চাই! কিন্তু আবার বলি, হে পুরুষ, আমাদের দিন আগত ঐ!

বেশ বুঝতে পারলুম যে নীলমণি আজ একটা কঠিন আবরণের কবচে নিজেকে ঢেকে কথা কইছে, সে কিছুতেই ধরা দেবে না।

প্রসঙ্গ বদ্‌লে দেবার অভিপ্রায়ে বল্লুম, তুমি কি আমার শেষ চিঠি পাওনি?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে, না, পায়নি।

বল্লুম, তবে অনেক খবর জান-না। মোক্ষদা মরে গেছে।

মোক্ষদা আবার কে?

মোক্ষদা, যার সঙ্গে আমার শুভ-পরিণয় হবার কথা ছিল।

নীলমণি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, হবার কথা ছিল? হয়নি?

না।

কি হয়েছিল তার?

টাইফয়েড্।

আহা! ব'লে সে হঠাৎ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেল।

তার ধ্যান ভাঙ্গল মাসীমা এসে ঘরে ঢোকায়। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে বল্লে, ব'সো, অনেক নতুন খবর শুন্‌তে পাবে, মাসী।

তুই চল্লি কোথায়?

আস্‌চি, একটা কাজ আছে, এখ্‌খুনি আস্‌বো, ব'লে নীলমণি তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

মাসীমা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কি নতুন খপর, কিরণ?

বল্‌তে কেমন লজ্জা করতে লাগ্‌লো; বল্লুম, শোনেন কেন ওর কথা?

হঠাৎ মাসীমা গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, বল্লেন পুরী থেকে ফেরার পর নীলমণি আমার একেবারে বদলে গেছে! কি ভাবে চেস্তায়—ওই জানে। সমস্ত দিন

লেখা-পড়া করছে! তাড়া-তাড়া চিঠি লেখে; আর ব'লে কাজ করতে যাবে। বলে, ঘরে ব'সে থেকে কি হবে? তুমিত বেশ সেরে গেছ।...আচ্ছা কিরণ, বল ত তুমি, ওর এমন কি অভাব হ'লো যে আজ কাজ ক'রতে যেতে হবে?

মাসীমা, অভাবের জন্যেই মানুষ কাজ ক'রে বটে; কিন্তু কাজ মানুষকে উঁচু করে।

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বল্লেন, কিন্তু তুমি ত' বাপু উল্টো কথাই ব'লছ! ছোট বেলা থেকে আমরা জানি যে, একদিন মানুষকে কাজ করতে হ'তো না, স্বর্গের বাগানে স্ত্রী-পুরুষ সুখে ছিল। তারপর এই পোড়াকপালি মেয়ে মানুষের দোষে মানুষ সেই স্বর্গ-সুখ হারিয়ে এই পৃথিবীতে দুঃখের ভাত খেটে উপায় করচে। কাজতো বাপু, ঈশ্বরের অভিশাপ!

মনে মনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম; এই বদ্ধ-সংস্কারের রুদ্ধ দ্বারে মুক্তির প্রবেশ নিষেধ! জীবনের কি কুৎসিত বিকৃত ছবি!

বল্লুম, মাসীমা, ঈশ্বর কি কাউকে অভিশাপ দেন? তিনি যা' দেন তা' মানুষের আশীর্ব্বাদ; তাতেই তার আনন্দ। মানুষ নিজের দোষে দুঃখ পেয়ে মরে।

মাসীমা যেন ব্যাপারটা কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না; বল্লেন, তা যাই হোক্ বাপু, আমি চাইনে যে ও চাকুরি করতে চ'লে যায়।...কিন্তু ওর ধনুর্ভঙ্গ পণ; যা' একবার বল্‌বে, তা থেকে সাধ্যি কার ওকে নিরস্ত করে। তুমি একবার ব'লে দেখো, যদি কিছু ফল হয়। তেমন কপাল কি আমার!

শব্দ করতে করতে বদন উপরে উঠে এলো। যেন সে কি বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল মাসীমাকে দেখে।

একটু এদিক-ওদিক ক'রে মাসীমা চ'লে গেলেন।

বদন আমার কাছে স'রে এসে বল্লে, বুঝেছ, হাবুদত্তর পেটের কথা সব টেনে বার ক'রেছি।

দেখা হলো?

না, না। তার মুখের একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনে। সেই ভাঙ্গা তোরঙের মধ্যে সব চিঠি ছিল... পাঁচশো টাকা মেরেছে—ওই সায়েব ব্যাটার কাছে!

কেন?

কি ছাই ইংরিজি মাথামুণ্ডু, আমি কি সব বুঝি? তবে বুঝলুম যে জিঠানি ভয়ানক রেগে গেছে। ব'লে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বল্লে, প'ড়ে দে'খ না, সব বুঝতে পারবে।

চিঠিখানা সরিয়ে বালিশের নীচে রেখে বল্লুম, পরে প'ড়বো ভাই, এখন কিছু ভাল লাগে না।

কেন, তোমার শরীর খারাপ হ'লো নাকি?

না, ভালই আছি।

নীলমণি ঘরে এসে ঢুক্‌লো, হাসিতে তার মুখখানি ভরা! বল্লে তোমাদের খাবার এই ঘরেই আনি?

বেশ তো।

* * * *

গম্ভীর গর্জ্জনে কাছের একটা টাওয়ার ক্লকে বারোটা বেজে গেল! বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে ছট্-ফট্ ক'রছি! চোখে এক পলকের জন্য এক ফোঁটা ঘুম আসে না!

বালিশের তলায় চিঠিখানা ছিল, সেটাকে পড়বার জন্য মনের ব্যাকুলতার আর শেষ নেই; কিন্তু সাধ্য কি পড়ার!

ঐ ঘড়ির চেয়ে গম্ভীরতর নিষেধবাণী উঠ্‌ছে বিবেকের মন্দির থেকে!

কোন অধিকার নেই তোর, এমনি ক'রে চুরি-করা পরের চিঠি পড়বার!

অন্ধকার আর বরদাস্ত করা যায় না, যেন, দম বন্ধ হ'য়ে আসে!

আলো জেলে চুপটি ক'রে ব'সে রইলুম;—যেন কিসের প্রতীক্ষায়! নিদ্রাহীন রাত্রির মন্থর পদ-ধ্বনি বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘা দিয়ে বলছে, এখনো সকালের যে অনেক দেরি!

চোখ দুটো বুজে নিশীথের নিস্তব্ধতার মধ্যে মনকে উৎসর্জ্জন ক'রে বল্লুম, যা' তুই, যত দূরে পারিস্—আকাশের কিণারায় তারাদের ঝিলিমিলি শান্ত আলোয়

নেচে ফিরেগে। অবোধ—অবাধ্য! ঘর ছেড়ে বাইরে এক-পা যাবে না! ঘরের দেয়ালের ঘড়িটির তালে তালে পা ফেলে সেই চির-প্রিয় নামটি জপ ক'রে ফিরতে লাগ্‌লো! ঝিঁঝির তানের ঐকান্তিক বেদনার তরঙ্গে নামের ছন্দের একি অপূর্ব্ব হিল্লোল স্পন্দন—চলেইছে বিরামহীন প্রবাহে!

চোখ চেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লুম, একি! তুমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছ?

নীলমণি বল্লে, বেশীক্ষণ নয়। কিন্তু তুমিই বা এমন ক'রে আলো জেলে বিছানায় ব'সে রোগা মানুষ রাত কাটাচ্চ কেন? নিশ্চয় তোমার অসুখ ক'রেছে!

না, অসুখ নয়; ঘুম হয় না।

কপালের উপর হাত দিয়ে সে বল্লে, কৈ না, জর ত হয় নি। বল্‌বে না কি হয়েছে?

বল্‌লুম তখন চিঠির কথা।

কৈ দেখি কি চিঠি?

সে চিঠিখানির এ পিঠ ওপিঠ দেখে বল্লে—জিঠানি লিখ্‌চে। এ চিঠি পড়ার আমার অধিকার আছে। আমার বিবেক একটুও না বলচে না।

আমার মুখের দিকে চেয়ে নীলমণি বল্লে, কেন জান্‌তে চাও? তবে বলি শোন:—

এই জিঠানিকে ঠিক করে জানার আমার একান্ত প্রয়োজন।... তার ওপর যেন কোন অবিচার না করি।... তোমার কোন আপত্তি আছে—আমার এই চিঠি পড়ায়?

না, নেই।

১১

নীলমণি চিঠিখানি পড়তে লাগ্‌লো—

প্রিয় দত্ত,

প্রতিশ্রুতির পাঁচশ' টাকার চেক্ দেওয়াই এ চিঠির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থাটা তোমাকে জানান আবশ্যক মনে করি।

এ দুনিয়ায় অর্থ সবাই চায় তা জানি; কিন্তু অর্থের প্রতি তোমার অপরিসীম লোভ। টাকার জন্য এমন কোন কাজ আছে, যা তুমি করতে পার না?

কেবলমাত্র একটা ঘটনা থেকে যদি এই কথা বলি তা'হলে নিশ্চয় তোমার প্রতি অবিচার করা হয়। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিন আগের। তুমি তা জান না। একদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, দুজনেই ছিলাম ছদ্মবেশে, আর জায়গাটা ছিল নোংরা। মনে আছে সেই নিরীহ বেচারি মেয়েটির কথা? মনে পড়ে, তোমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে তোমাকে কত টাকা ঘুষ দিয়েছিলাম? এতদিন কিন্তু কোন ধারণাই ছিল না যে তুমিই সেই। তোমাকে চিনতে পারলুম—হঠাৎ—সে রাতের সেই সয়তানি হাসি দেখে!

আগে জান্‌লে কিছুতেই তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'রে জীবনে এতবড় ভুল করতাম না নিশ্চয়। আমি কাউকে দোষ দিচ্চিনে। শুধু বিশ্বাস করি যে, এক একটা প্রবৃত্তি বংশ পরম্পরায় চ'লে আস্‌তে থাকে। তোমার এই অর্থ-লোলুপতা, হিলাতে আসে নি, এমন কথা কি বল্‌তে পার?

অন্যকে দোষ দেবার আগে মুক্ত কণ্ঠে আমি নিজের দোষ স্বীকার করবো। যে জিনিষের প্রত্যাশায় বিয়ে ক'রেছি তা লাভ করার মত কোমলতা আমার মনে নেই। কল্পনায় মনে করেছিলুম—হয়তো বা আছে; হয়তো বা একদিন ছিল; কিন্তু নেশায় নেশায় আমি একটা সম্পূর্ণ জান্‌ওয়ার ব'নে গেছি! তার প্রমাণ এই শেষদিনের ঘটনা!

মনে জানতুম যে, কেবল একটা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করার জন্যই লীনাকে চাই; কিন্তু মদে আর নির্জ্জনতায় আমার ভিতরের সয়তান জেগে উঠ্‌লো! কত বড় অন্যায় যে ঘটে গেছে—তার কোন ঠিক্-ঠিকানা নেই, দত্ত!

তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না জানি; কিন্তু সেই-দিনের কথা মনে করলে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা

হয়। আমি ভীরু কাপুরুষ! তাই এত অনুতাপেও বেঁচে আছি!

আমি আর ভারতবর্ষে ফিরবোনা; কিন্তু হিলার জন্য সব ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি। আর সে যদি কোনদিন ইংলণ্ডে আসতে চায় ত' তার ব্যবস্থা ক'রবো। এখন তাকে কোন কথা লেখবার আমার সাহস নেই। দিনকতক যেতে দাও।

আরো অনেক কিছু বলার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তুমি সে কথা শোনার উপযুক্ত নও। শেষে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমি সয়তান তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমি একান্ত সাধুতা বর্জ্জিত নই; অন্যায়ের জন্য আমার চোখে জল আসে; আমি বুঝি যে কি নির্ম্মল নিরীহ সুন্দর চরিত্রের উপর কি ভীষণ অত্যাচারই না ক'রেছি! কিন্তু তুমি আমার চেয়ে শত শত গুণ বেশী সয়তান; তাই তুমি কিছুই বুঝবে না। তোমার হৃদয় ব'লে কোন বস্তু নেই। লোকের দুঃখে তোমার চোখ দিয়ে জল বার না হ'য়ে—বার হয় নরকের আগুনের লকলকে শিখার মত ভয়ঙ্কর হাসি! জীবনে দুদিন আমি ঐ হাসি দেখেছি—আর সে তোমারই চোখের মধ্যে! ইতি জিঠানি।

চিঠিখানা পড়ার পর আমাদের বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হ'য়ে গেল। দুজনে পরস্পরের প্রতি চেয়ে সময় কেটে যেতে লাগলো।

নীলমণির চোখ দুটো যেন দুখানি জলন্ত অঙ্গার, তাতে বাষ্পের লেশ নেই! ছিল কেবল কঠিন সংকল্পের অটলতা! যেন আর তাকে কিছুতেই ফেরান যাবে না। সে কথা বলতে যাওয়া মাত্র বাতুলতা!

কিছুক্ষণ এমনি ক'রেই কেটে গেল। অবশেষে নীলমণি সহসা উঠে চ'লে গেল।

ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম, এই একটি আড়ম্বরহীন জীবন, নির্জ্জনে দুহাতে সেবা ভালবাসা বিলিয়ে দিয়ে একটি ছোট নির্ঝরের মতই ব'য়ে চ'লেছিল! হঠাৎ কোথা থেকে এলো প্লাবন! আজ তার গতিকে প্রপাতের মত উদ্দাম উচ্ছল ক'রে তুলেছে!

কে তার গতিরোধ করে? কে তাকে বলবে, ওগো তুমি দাঁড়াও!

তেপায়ের উপর চায়ের পেয়ালা রাখতে রাখতে নীলমণি বল্লে, তোমাকে এখেনে কিছুদিনের জন্যে থাকতে হবে যে।

কথার উত্তর না দিয়ে আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

একটু হেসে সে বল্লে, কেন?…আমি যে আজই চ'লে যাচ্ছি। মাসীমা বড় একলা হয়ে প'ড়বেন? তুমি তাঁর প্রথম ধাকাটা সামলে দিও, নইলে বড় আঘাত পাবেন।

নীলমণি, আরো দিন কয়েক পরে যেও।

সে মৃদু হেসে বল্লে, না তা' হবে না।…বৃথা অনুরোধ করে তোমরা আর আমার অপরাধের ভার বাড়িও না।… মানুষের জীবনে এমন সব মুহূর্ত্ত আসে যাকে অবহেলা করা চলে না; তাকে বৃথা ব'য়ে যেতে দিলে চিরজীবন তার জন্য অনুতাপ করতে হয়।

শেষ ক'টি কথার সঙ্গে তার প্রাণের সমস্ত সুরগুলি যেন ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠলো। মনে হলো, এত বড় সত্য বুঝি আর এ সংসারে উচ্চারিত হয় নি! একে অস্বীকার করা সহজ ত নয়-ই; হয়ত একান্ত অসম্ভব।

বললুম, শুধু মনের একটি অভিলাষ নিবেদন করেছিলুম; তোমার পথের আমি বাধা হ'তে চাইনে নীলমণি!

সে হেসে বল্লে, তাই জানি ব'লেই ত' এ কথা তোমায় ব'লতে পারি। আর কাউকে বল্লে, সে এর অর্থ—এমন কি ইঙ্গিতটুকুও হয়ত বুঝবে না।

নীলমণি বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়ে বল্লে, লক্ষীটি একটু ঘুমোও।……সব কথা তুমি জানতে পারবে। তোমাকে লুকিয়ে—তোমার অমতে কিছুই ক'রবো না।

শুয়ে প'ড়ে, চোখ বুজে বেশ বুঝতে পারলুম যে, আমার জীবনে সকল অনিশ্চয়তার মধ্যে কোথায় যেন একটি ধ্রুব তারা জলছে! অনন্ত গতির মধ্যে একটি বিন্দুর স্থিতি! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ভরে' সেখেনে একটি রক্ত কমল ফুটে আছে! তার উপর চরণ-পদ্ম রেখে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি একান্ত দুর্লভ হলেও—আমার ভাগ্যে মরীচিকার মত কেবলই মায়া নয়!

* * *

বিদায়ের নিদারুণ মুহূর্ত্তটি ক্রমেই সন্নিকট হ'য়ে আস্‌চে! যেন তার পা ফেলার শব্দের ধ্বনিটি আমারই বুকের মধ্যে সবার আগে বেজে উঠেছে!

শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি! নীলমণি এসে বল্লে, এখন যে যাবো!

নির্ব্বাক নিস্পন্দ জড় পাহাড়ের মত ব'সে রইলুম। সে চ'লে গেল ক্ষিপ্র-গতি নির্ঝরিণীর মত—অসীমের পথে, লবণাক্ত জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়তে!

একবার চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হ'লো;—গলা দিয়ে শব্দ বার হয় না; অশ্রুর পুঁজি একেবারে নিঃশেষ ক'রে ব'সে আছি! শুধু সম্বল তার শেষের চিঠি খানি!

শেষ

---

# গতি

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

দুঃখ জাগে—ব্যথা লাগে এ যে নিছক হাড়ের গুণ;
এই যে বিধান—কোকিয়ে কাঁদায় টল্‌বে না।
বিদ্রোহেতে হাত-পা ছুঁড়ে মাথা খুঁড়ে হবে খুন্;
নাড়ীর সাথে আড়ি করা চল্‌বে না।

গোলামীতে পেতে মাথা সইব তবে যাচ্ছে তাই?
সাধের আশা সাধনে কি ফল্‌বে না?
ঠাণ্ডা মাথায় কওগো কথা, একটুখানি আস্তে ভাই;
বদ্ধ পাষাণ বাসনাতেই গল্‌বে না।

যে আগুনে প্রাণটা রাঙ্গা, যাবে নিবে এক ফুঁয়ে?
নেবার পরে আবার ফিরে জ্বল্‌বে না?
বদ্‌লাবে না আদৎটি তার দয়ায় ভিজে, একগুঁয়ে;
সত্যকে সে মিথ্যা ভাষে বল্‌বে না।

ওই-যে বিধান চল্‌ছে সটান—ধূলায় মাজা চক্‌চকে;
গতির চরম—মরণে সে ঢল্‌বে না।
বিশ্ব ঘোরে পুড়েও বাড়ে, টাট্‌কা, তাজা, লক্‌লকে,
জরার বালাই পায়ের তলায় দল্‌বে না।

হেঁটে ঘড়ির কাঁটার মত কালের কোঠা যাও ঘুরে;
চল্‌লে যুঝে, কেলে জুজু ছল্‌বে না।
দুঃখ থাকুক্, যমে ডাকুক্; ফুল্ল মুখে ধাও দূরে;
রোদন-রসে সাধন-তরু ফল্‌বে না।

---

# কেশবচন্দ্র

শ্রীসত্যানন্দ রায়

বাংলা দেশের মুখোজ্জ্বল করে যে সব কৃতি সন্তান গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশব চন্দ্র সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যা করেছিলেন তা সহজে ভোলবার নয়। অনেকে জানেন না কেশব চন্দ্রই এই বাংলা দেশে আধুনিক যুগে সহজ সরল ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে দেশ, সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা আলোচনার পথ খুলে দেন। তাঁর সঙ্গীগণ যখন বাংলা-দেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘুরে তাঁদের নতুন বার্ত্তা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন সেই সময় হ'তে এদেশে এক নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছিল। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা, সাধু মহাপুরুষদের জীবনী লিখন, গ্রামবাসিগণের বোধগম্য ভাষায় ধর্ম্মের মূল সূত্রের ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মজীবনের বিবৃতি, গান ও সঙ্কীর্ত্তন এই সকল তখন দেশের কর্ম্ম ও ভাবরাজ্যে এক নতুন স্রোত বহাইবার পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল।

কেশবচন্দ্রেরই চেষ্টায় এ দেশে সর্ব্বসাধারণের জন্য এক পয়সা মূল্যের "সুলভ সমাচার" প্রথম প্রকাশ হয়। তখন "সুলভ" বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলকে দেশের ও দশের কথা শুনাইত। কিন্তু কেশবচন্দ্র কেবল "সুলভ সমাচার" প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি যেমন বয়স্ক লোকেদের জন্য সংবাদ প্রকাশ করিলেন তেমনি অল্প বয়স্কদের জন্য "বালক বন্ধু" নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্বদিকেই ছিল, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন সকলকেই তাঁহার বার্ত্তা শুনাইবার জন্য ডাকিয়াছিলেন ও সকলের অভাব বুঝিতে পারিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় পুস্তিকা লিখিয়া পথে, ঘাটে, রেল ষ্টেশনে সেই সব বিতরণ করিবার ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। জনশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আজ দেশের লোকেরা কত ব্যগ্র। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র জনশিক্ষার প্রচার উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিবার দিন আজ আসিয়াছে।

বিগত ৮ই জানুয়ারী, কেশবচন্দ্রের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কলিকাতা সহরে তাঁহারই চেষ্টায় যে Albert Hall একদিন স্থাপিত হয় সেই Albert Hall-এ কলিকাতার সহরবাসিদিগের একটী মহতী সভা হয়। সেই সভায় অনেক স্বদেশীয় বিদেশীয় প্রসিদ্ধ বক্তা কেশব চন্দ্রের জীবনের এক একটী দিক লইয়া কিছু কিছু বলেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা কেশবচন্দ্রের জীবনের কার্য্য ও তাঁহার বার্ত্তা সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল আজিকার দিনে দেশে যে যুগের আবির্ভাব হইয়াছে, কেশবচন্দ্র সেই যুগবার্ত্তা ঘোষণার অগ্রদূত। জাতীয়তা ও সর্ব্বজাতীয়তা বিষয়ে আজ দেশ বিদেশে এত কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার যথার্থ উদ্বোধন এ দেশে কেশবচন্দ্রের সময়েই হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে এই কলিকাতা সহরের সেবক ছিলেন, পরে

বাংলাদেশের সেবক হ'ন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের সেবায় মনোযোগ দেন। পরে এশিয়া মহাদেশের সেবায় জীবনকে নিয়োজিত করেন। আর সব শেষে, সমগ্র জগতের সেবক কেশবচন্দ্র যখন তাঁহার প্রাণের কথা জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন তখন কত শত সহস্র লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যেই একজন বলিলেন "কেশব যখন বলেন সমস্ত জগৎ তখন তাহা শুনিতে পায়।" আজ আমাদেরই দেশের এক কবির কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একদিন সত্যেন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা খাটে। কেবল মাত্র কবি-সভায় নয় কিন্তু জগতের বাগ্মী-সভায় কেশবচন্দ্রের জন্য গর্ব্ব অনুভব করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে।

আজ দেশের মধ্যে যে নবজাগরণ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় সেই জাগরণের প্রারম্ভে দেশবাসিগণকে জাগিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু কর্ম্মী কেশব-চন্দ্রের জীবনকালে, রামমোহনের সময় যাহা বীজাকারে ছিল, তাহা বৰ্দ্ধিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষের আকারে দেখা গিয়াছিল। সেই বৃক্ষই আজ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। তাই কেশবচন্দ্র সেদিন মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির অগ্রগামী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। আজ মহাত্মা গান্ধী যে হিন্দীভাষার প্রচলনের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন তাহা সমীচীন বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আর্য্য সমাজের নেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতায় আসেন তখন কেশবচন্দ্র তাঁহাকে হিন্দী ভাষায় আর্য্যধর্ম্মের সত্য প্রচার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দেশের সকল লোকের বোধগম্য ভাষায় কথা কহিতে না পারিলে দেশবাসীর হৃদয়দুর্গ কি করিয়া অধিকার করা যাইতে পারে?

সর্ব্বসাধারণের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি কত ভাবে হইত তাহা কে না জানে? এ দেশে শিক্ষিতদের মধ্যে আবার যখন সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ফিরিয়া আসিল তখন যে নাট্যকলাও পুনর্জীবন লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? কেশবচন্দ্র শৈশবে ও যৌবনে যাত্রা অভিনয় প্রভৃতিতে অনেক সময় কাটাইতেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁর সাধনা যে পথে যাইতেছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারই এক বিশিষ্ট সহযোগী, যিনি চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামে সাহিত্য জগতে সুপরিচিত, তাঁহার রচিত "নববৃন্দাবন" নাটকে কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে লব্ধ উচ্চতম সাধনার পরিণতি দেখিতে পাই। সেই সাধনার ফলে কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া নাট্যকার যে দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন সেই নব-বৃন্দাবনে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধার্ম্মিকে বৈজ্ঞানিকে, পণ্ডিতে ভণ্ডে, জ্ঞানীতে কর্ম্মীতে, যে এক মহামিলনের ছবি দেখাইয়াছেন তাহা এই ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতেই সম্ভবপর হইতে পারে। যাহাদের মধ্যে আমরা আপাতত বিরোধ দেখি, কেশবচন্দ্র তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলেন ও তাহাদের সমন্বয় সাধনের জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের জীবন এক হিসাবে বড়ই কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য। তাঁহার জীবনের ঘটনা, তাঁহার আদর্শের অভিব্যক্তি এখনো অনেকের বোধগম্য হয় না। যিনি, এ দেশে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা সম্পর্কে যত অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার অনুপ্রাণনারূপে দেশের নেতাদের নমস্য হইয়াছিলেন তাঁহাকে অনেকেই বুঝিতে না পারিয়া বিদেশী বিজাতীয়, বিধর্ম্মী প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগে তাঁহার কত দুর্নাম করিয়াছেন, কত কুখ্যাতি প্রচার করিয়াছেন। সে আজ প্রায় সতের বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই কলিকাতা সহরে তাঁহার মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে যে সভা হয় তাহার সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে যে বিরোধভাব পোষণ করিতেন তাহা উল্লেখ করিয়া যাহা বলেন তাহা আজও আমাদের কানে বাজিতেছে :—

"পৃথিবীতে জনসমাজের পাপ দুর্গতি নাশের জন্য সাধু মহাত্মারা আসিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী সময়ের লোকেরা মনে করে যে, আহা আমি যদি সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিতাম তবে ভাগ্যবান হইতাম, আমি এই ভক্তের সময়ে জন্মিয়াও তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ভোগ
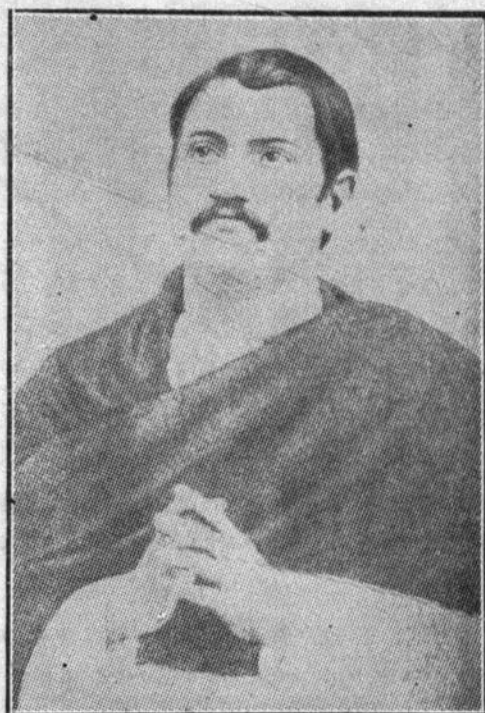
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

করিতে পারি নাই। তিনি যখন স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্দীপ্ত হইরা আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন এবং আমার পিতৃগৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমি সদ্যপ্রসূত শিশু। তারপর যখন আমি বালক, কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মসমাজে বিরোধের সময়। আমার মনেও সেই বিরোধের ভাব। আমার মনে হইত তিনি যে ধর্ম্ম, যে সত্য প্রচার করিতেছেন তাহা আমাদের স্বদেশীয় নয়, বিদেশী। তাঁকে নিয়ে যখন খুব গোলমাল হচ্চে তখন তাঁর প্রতি আমার একটা বিরোধভাব এসেছিল এটা আমার বেশ মনে আছে। আমারও মনে হয়েছিল তিনি যেন আমাদের দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। আর আজ দেখছি মহত্বের প্রকাশ বিরোধভাবের মধ্যে দিয়েই হয়ে থাকে।......যেমন দেখা যায় ধোঁয়ার প্রাচুর্য্যে আগুনকে দেখা যায় না, আমি তেমনি তখন তাঁর তেজের কিছুই দেখতে পাইনি। যে মহাপুরুষের কীর্ত্তি বলতে এসেছি তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল, অথচ কি একটা কুহেলিকা এসেছিল যে তাঁর সঙ্গে যোগ স্থাপন কর্ত্তে পারি নি।......তখন আমার মনে হোত বুঝি আমাদের স্বদেশের যে মাহাত্ম্য আছে সেই মহাপুরুষ সে গৌরবের কিছু ব্যাঘাত করছেন, বিদেশী সত্যের মাহাত্ম্য বুঝি এত বড় করে প্রকাশ করেছেন, যে তা'তে আমাদের গৌরব খর্ব্ব করেছেন। তখন বোল ছিল স্বদেশী। এই তখন দম্ভ দর্প ছিল। আমার একটা ধারণা ছিল যে, যিনি যে দেশের মহাপুরুষ তিনি সে দেশের বাণী সকলকে বলতে বাধ্য। যখন কেউ স্বদেশের বাণী না বলে বিদেশী কোন মহাপুরুষের বাণী, জ্যোতি লাভের কথা বলেছেন তখনই সকলে মনে করেছে ইনি বুঝি বিরুদ্ধবাদী। এ হয়েই থাকে। আর তাঁরা আসেনই সেই সময় যখন আমাদের স্খলন হয়েছে......সেই সময় বাইরের আচরণটা সরিয়ে ফেলতে চান যাঁরা, তাঁদের তখন বিরুদ্ধবাদী বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত পুরাতন ঋষিবাক্য উদ্ধার করবার জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এসেছিলেন। স্বাদেশিকতার গণ্ডীর বাহিরে তাকে অনেকদিন ধরে রেখেছিলাম, কিন্তু তা আর রইল না।.........আমরা বিরোধ দ্বারা কিছুতেই তাঁকে গ্রহণ করতে পারবো না। আমরা অন্য ধর্ম্মকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। সেই সত্যের বিদ্রোহ পতাকা আমরা তুলেছি। যিনি সে সত্যকে প্রচার কর্ত্তে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে আমরা শত্রু বলে মনে করি। গুরু নানক মহম্মদ প্রভৃতিকেও বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করেছি। ........যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁকে সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা এই কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা এবং তাই নূতন করে তিনি লাভ করে নববিধান বলে প্রকাশ করেছেন। এ যখন আমি বুঝলাম, সে বিরোধ আমার ঘুচে গেল।"

কেশবচন্দ্রের জীবন যেমন একদিকে জটীল ও অন্য সকলের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে তেমনি অপর দিকে তাঁহার জীবন এমন সহজ ও মিলনময় যে, যতই দিন যাইতে থাকিবে ততই তাঁহার জীবনের শেষোক্ত বিশেষত্ব দুইটী ফুটিয়া উঠিবে। এ বৎসরে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য যে সভা আহূত হয় তাহা দেখিয়াই সে কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে Frederick Harrison-এর এই উক্তিও মনে পড়িল, "Society can overlook murder, adultery or swindling; it never forgets the preaching of a new gospel." কেশবচন্দ্রের দেশবাসীরা কি তিনি নূতন বার্ত্তা প্রচার করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কখনো ক্ষমা করিবেন?

## রম্যাঁ রলাঁ

[ শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী অনূদিত ]

### দ্বিতয় খণ্ড

### প্রভাত

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

#### মিন্না

মহিলাটি নিজে ক্রিস্তফদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। একদিন সকালে যখন সে খাইতে আসিয়াছে লুইসা ক্রিস্তফ্‌কে সগর্ব্বে জানাইল যে, খুব জঁকাল তক্‌মা পরা একজন চাপরাশী তার জন্য একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে ; কালো দাগ দেওয়া মস্ত একখানা খাম, কোণে সেই মহিলাটির পারিবারিক সীলমোহর; ক্রিসতফ্‌ কম্পিত হৃদয়ে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল :—

"দরবারী ওস্তাদ ক্রিস্তফ আজ অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকায় জোসেফা ফন্ কেরিশ ঠাকুরাণীর সঙ্গে চা পান করিলে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হইবেন।"

হঠাৎ ক্রিস্তফ্‌ বলিয়া বসিল ; "আমি যাব না।" লুইসা চীৎকার করিয়া বলিল "যাবি না কি ? আমি যে বলে দিয়েছি তুই ওদের বাড়ী যাবি......।"

ক্রিস্তফ্‌ একেবারে আগুন হইয়া মাকে বকিতে লাগিল, "আমার কাজে তোমার কথা বল্‌বার দরকার কি ছিল" ইত্যাদি—

"আমি কি করব বাছা ? চাপরাশী দাঁড়িয়ে ছিল জবাবের জন্যে ! তাই আমি বলেছি তুই যেতে পারিস—তোর ত ঐ সময়ে কোন কাজ থাকে না......"

ক্রিস্তফ্‌ চটিয়া শপথ করিল সে কিছুতেই যাইবে না—কিন্তু বুঝিল সে সবই বৃথা—এখন আর এড়ান যায় না। সময় যতই ঘনাইয়া আসিল গজরাইতে গজরাইতে সে প্রস্তুত হইল ! ঘটনা চক্র যে এমনি করিয়া তার অনিচ্ছাটার উপর জবরদস্তি করিতেছে তাহাতে সে যে ভিতরে খুশী হয় নাই তাহাও বলা যায় না।

জোসেফা ঠাকুরাণী সহজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন

যে, দরবারী পিয়ানো বাদকটি সেই ঝাঁকড়া চুল দুষ্টু ছেলে, যে তাঁদের পৌছানর দিন প্রাচীরে চড়িয়া ভিতরে উঁকি মারিতেছিল। তার সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ করিতেই তিনি সব জানিয়াছিলেন ;—ক্রাফট্ পরিবারের অবস্থা—এবং এই নির্ভীক ছেলেটির কঠোর জীবন তাঁর মনে ঔৎসুক্য জাগাইয়াছিল। তিনি ক্রিস্তফের সঙ্গে কথা বলিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন।

ক্রিস্তফ্ একটা বদখদ্ পোষাক পরিয়া যেন পাড়াগেঁয়ে পাদ্রী সাহেবের মত আসিয়া হাজির হইল! বাড়ীটি নিস্তব্ধ অথচ সে যেন লজ্জায় অধীর! সে নিজেকে বোঝাইতে চেষ্টা করিল যে, প্রথম যে দিন তার সঙ্গে মহিলা ও কুমারীটির দেখা হয় তাঁরা ভাল করিয়া তার মুখ চিনিতে পারেন নাই। একটা চাকর মোটা কারপেট্ মোড়া বারান্দার ভিতর দিয়া তাকে লইয়া চলিল, পায়ের একটু শব্দও হয় না; ঘরখানি বাগানের উপর বড় কাঁচের শার্সি ঢাকা; দিনটা ঠাণ্ডা—একটু বৃষ্টি হইয়াছিল। কোণে অতি আরামদায়ক একটি অগ্নিকুণ্ড। জানালার ভিতর দিয়া বাইরে ভিজা গাছগুলি কুয়াশা মুড়ি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায়; দুটি মহিলা সেই জানালার কাছে বসিয়া আছেন। মা কাজে ব্যস্ত, মেয়েটি বই পড়িতেছে এমন সময় ক্রিস্তফের প্রবেশ! তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহিলা দুটির চোখে যেন একটা অর্থপূর্ণ অথচ গোপনদৃষ্টি ভাসিয়া উঠিল, ক্রিস্তফ্ লজ্জায় অস্থির হইয়া মনে মনে বলিল, "আমাকে চিনে ফেলেছে!" যতই এ কথা ভাবে ততই তার আড়ষ্টতা বাড়িয়া যায়! মহিলাটি যাহাকে তাঁর আনন্দ মুখর হাস্যে হাত বাড়াইয়া ক্রিস্তফ্কে অভিনন্দিত করিলেন :—

এই যে এসেছেন—আপনাকে আজ এখানে পেয়ে আমরা খুব সুখী হয়েছি; সেদিন কনসার্টে আপনার বাজনা শুনে অবধি সুযোগ খুঁজছিলাম, কবে আপনাকে জানাব যে আপনার বাজনা আমার কত ভাল লেগেছে। কিন্তু বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না করলে ত আপনাকে সে কথা জানান সম্ভব নয় তাই ডেকে যদি আপনাকে বিব্রত করে থাকি ক্ষমা করবেন ত?

এই সব সাধারণ ভদ্রতার কথাগুলি এমন সহৃদয়তার সঙ্গে মহিলাটি বলে গেলেন যে, তার তলায় একটু বিদ্রূপের খোঁচা লুকান থাকিলেও ক্রিস্তফ্ বেশ সহজ হইয়া উঠিল। সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিল—

"না, এ যাত্রা আমায় চিন্‌তে পারেনি।"

মা মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন—মেয়েটি বই মুড়িয়া ক্রিস্তফের দিকে বেশ ঔৎসুক্যভরে চাহিয়াছিল।

"এই আমার মেয়ে মিন্‌না আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে কত দিন থেকে—"

মেয়েটি কিন্তু হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"বাঃ এই বুঝি প্রথম আমাদের দেখা......"

ক্রিস্তফ্ একেবারে দমিয়া গেল—"তাহলে ত এরা আমায় চিনে ফেলেছে!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, প্রথম যে দিন আমরা এ বাড়ীতে আসি আপনি আমাদের দেখা দিয়েছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে কুমারীটি হাসিয়া উঠিল, ক্রিস্তফের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে, মিন্‌না যতবার তার মুখের দিকে তাকায় ততবার হাসিয়া অস্থির হয়। সে আর নিজেকে যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না; হাসির তোড়ে যেন সে ভাসিয়া যায়! মা মেয়েকে সাম্‌লাইতে গিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন; এমন কি ক্রিস্তফ্ও সেই আড়ষ্টতার মধ্যে হাসির ছোঁয়াচে অস্থির হইল। কারো সাধ্য নাই রোধ করে, কেউ বিরক্ত হইল না; কিন্তু একটু সাম্‌লাইয়া মিন্‌না যখন ক্রিস্তফ্কে প্রশ্ন করিয়া বসিল যে সে দিন সে প্রাচীরে চড়িয়াছিল কেন, বেচারী একেবারে যেন বসিয়া পড়িল। তার অবস্থা যতই সঙ্গীন হয় মেয়েটির দুষ্টুমী ততই বাড়ে। ক্রিস্তফ্ যেন বেকুব বনিয়া গেল; এমন সময় মা আসিয়া চা দিয়া কথার স্রোতটা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন—ক্রিস্তফ্ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মহিলাটি সস্নেহে ক্রিস্তফের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলিলেন কিন্তু তিনি তার মন পাইলেন না; সে না পারে বসিতে, না পারে ঠিক করিয়া চায়ের পেয়ালা

ধরিতে ! দুধ, চিনি, কেক্ যাহা কিছু তাঁরা দিতে যান ক্রিস্তফ্ আড়ষ্ট ভদ্রতায় অস্থির হইয়া চট্ করিয়া উঠিয়া ধন্যবাদ দেয়—কলার-কোট আঁটা সেই চেহারা দেখিয়া মনে হয় যেন সে কচ্ছপের মত আড়ষ্ট ! সে কোন দিকে যেন ঘাড় ফিরাইতে পারে না অথচ মহিলাটি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যাইতেছেন ; একদিকে মা'র আগ্রহ ব্যবহার অন্যদিকে কন্যাটির অদ্ভুত দৃষ্টি—যেন তার পোষাক চাল চলন চেহারা সব মনে মনে আঁকিয়া লইতেছে—ক্রিস্তফের রক্ত হীম ! এমনই তারা যতই চেষ্টা করে ক্রিস্তফকে সহজ করিয়া তুলিতে সে ততই অস্বস্তি বোধ করে ; মা'র কথার স্রোত, মেয়েটির ন্যাকামীভরা চাহনি—সব যেন তাহাকে লইয়া একটা রঙ্গ করিবার উপায় মাত্র বলিয়া বোধ হইতেছিল। শেষে ঘাড়নাড়া এবং 'হাঁ' 'না' ছাড়া যখন আর ক্রিসতফের নিকট হইতে আর কিছু পাওয়া যাইতেছিল না, যখন সব কথার চাপটা গৃহকর্ত্রীর উপরই পড়িবার যোগাড় হইল তখন জোসেফা শ্রান্ত হইয়া ক্রিস্তফ্কে পিয়ানো বাজাইতে অনুরোধ করিল। কনসার্টের বিপুল জনসঙ্ঘকে যে ভয় পায় নাই সে যেন এই দুটি মানুষের সাম্নে কাঁপিতেছে—তবু ধীরে ধীরে সে মোজার্টের ( Mozart ) একটা গৎ বাজাইতে শুরু করিল। তার অত্যধিক লজ্জা, মহিলা দুটি কাছে থাকার দরুণ সঙ্কোচ, সুখ ও অস্বস্তির দ্বন্দ্বে বুকের মধ্যে ভাবের তোলপাড়—সবটা যেন মোজার্টের সেই সলাজ তারুণ্যদীপ্ত সঙ্গীতের সঙ্গে ছন্দ রাখিয়া বাজিতেছিল—সে যেন বসন্ত-উৎসবের কুহক-মন্ত্র মুখরিত আলাপ। মহিলাটির প্রাণ ভরিয়া উঠিল ; ভদ্রভাবে মানুষ যে সব প্রশংসার কথা বলে তাহা তাঁর মুখ হইতে অতিশয়োক্তির আবেগ লইয়া বাহির হইল ; তাহার সঙ্গে যে খানিক সরলতাও ছিল না তাহা নহে ; এবং সেই সুন্দর মুখখানি হইতে যে স্তবগান উঠিতেছে তাহা সরল হোক বা নাই হোক ক্রিসতফের মনকে তাহা মাতাইয়া দিল। মিন্না মেয়েটি "মিটমিটে ডান" সে একটি কথাও বলিল না কিন্তু ভিতরে ভিতরে বেশ অবাক হইয়াছিল যে, এই যে বোকা ছেলেটা কথা বলিতে লোক হাসায় তার অঙ্গুলী চালনায় এতখানি কবিত্ব ও মাধুর্য্য আসিল কি করিয়া ! ক্রিস্তফ্ ক্রমশ অনুভব করিল যে, শ্রোতা দুটির সহানুভূতি সে টানিয়া লইতেছে—তাহার সাহস বাড়িয়া গেল ; সে বাজাইতে বাজাইতে মিন্নার দিকে একটু ফিরিয়া, চোখ না তুলিয়া, দ্বিধা ভরা গলায় একটু হাসিয়া বলিল—

"পাঁচিলের উপর চড়ে সে দিন এই কাজই ত করছিলাম !

ক্রিস্তফ্ একটি ছোট সুরের আলাপ করিল ; সেই সুরটি ঠিক যে সেদিনই প্রাচীরের উপর হইতে মা ও মেয়েটিকে দেখিতে দেখিতে রচনা করা তাহা নহে—তবু কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিজেকে সে বুঝাইতে চাহিতেছিল যেন সেই অসময়েরই ! যা'হোক সেই সুরটির মধ্যে বাজিতেছিল পাখীর কলসঙ্গীত, পাতার মর্ম্মর তান, বনস্পতীর গভীর নিদ্রা এবং সূর্য্যাস্তের প্রশান্তি।

ক্রিস্তফের শ্রোতাদু'টি আনন্দে বিভোর হইয়া আলাপ শুনিতে লাগিল। শেষ হইবামাত্র জোসেফা উঠিয়া আসিয়া দুই হাতে ক্রিস্তফের হাত চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছসিতভাবে ধন্যবাদ দিলেন। মিন্না তালি দিয়া বলিল, "চমৎকার ! এমন সুন্দর জিনিষ যদি রচনা করা হয় তা হলে আমি পাঁচিলের গায়ে একটা মই রেখে দিতে রাজী আছি—নিশ্চিন্ত মনে তার উপর চড়ে রচনা করবেন !"

মা ধমক্ দিয়া বলিলেন, "তোকে আর জ্যাঠামী করতে হবে না—পাগলীটার কথায় কান দেবেন না আপনি, যখন ইচ্ছা আপনার এই প্রিয় বাগানে আস্বেন ; আর যদি ভাল না লাগে আমাদের সঙ্গে দেখা না করলেও চল্বে, শুধু বাগান বেড়িয়ে যাবেন..."

মিন্না ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল ; "আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কেন কষ্ট করবেন ? তবে যদি এসে পড়েন—সাবধান হবেন !"

তার কথার ভঙ্গীতে যেন ঝাঁঝ ভরা। মিন্না ভাবে নাই যে, ক্রিস্তফ্ আবার তাদের সঙ্গে আড়ষ্ট ভদ্রতার নিয়মকানুন মানিয়া চলিবে ; তবু একটু মিষ্টি খোঁচা দিবার লোভ সে সামলাইতে পারিল না।

ক্রিস্তফ, ত লজ্জায় লাল! জোসেফা তার মা ও দাদামশায়ের কথা পাড়িয়া তার হৃদয় একেবারে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; মহিলা দুটির সহৃদয়তা ও যত্ন তার প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে; এবং তাদের শিষ্টতা ও সহজ আপ্যায়নকে সে গভীর সম্বন্ধের লক্ষণ বলিয়া বাড়াইয়া ভাবিল, তাহার ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্খা ও বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা সব বলিতে সুরু করিল, তার হুঁশ নাই যে, একঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে! চাকর নৈশভোজের খবর দিতে তার চমক ভাঙ্গিল; লজ্জায় পড়িতে দেখিয়া জোসেফা বন্ধুভাবে ক্রিস্তফ্‌কে খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন; মা ও মেয়ের মাঝখানে তার স্থান করা হইয়াছিল কিন্তু পিয়ানোতে বসিয়া যেমন ক্রিস্তফের বুদ্ধি খুলিয়াছিল টেবিলে মোটেই তেমন হইল না। এ বিষয়ে শিক্ষার অভাব তার যথেষ্ট ছিল; সে ভাবিত টেবিলে শুধু খাইতে হয় কিন্তু খাওয়ার সঙ্গে আলাপ আপ্যায়নের যে আদব কায়দা আছে তা' নগণ্য সুতরাং কেতা-দোরস্ত মিন্নার চোখে ক্রিস্তফের চালচলন খুব বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ঠোঁট ফুলাইয়া সে শুধু নিজেকে সামলাইয়া লইতেছিল।

তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ক্রিস্তফ ভোজনের পর বাড়ী ফিরিবে কিন্তু দেখা গেল যে, ক্রিস্তফ্ তাদের পিছু পিছু বসিবার ঘরটিতে আসিল এবং বসিয়া নড়িবার আর নাম নাই! মিন্না বহু কষ্টে হাই-তোলা ঠেকাইয়া মাকে ইসারা করিল তবু ক্রিস্তফ্ বোঝে না—সে আপন আনন্দে মশ্‌গুল এবং ভাবিতেছিল সকলেই তার অবস্থায় আছে! কারণ মিন্না তার অভ্যাস মত মুখ চোখ ঘুরাইতেছিল আর ক্রিস্তফ্ একবার বসিলে কি বলিয়া উঠিতে হয় ভাবিয়া পাইতেছিল না! এমনিভাবেই সে হয় ত বসিয়া থাকিত কিন্তু জোসেফা শেষে ভদ্রতা কাটাইয়া অথচ স্নেহভরে তার কাছে বিদায় লইয়া তাকে বাড়ী চালান দিলেন।

ক্রিস্তফ বাড়ী ফিরিল; তার বুকের মধ্যে দুখানি মুখের দুটি দৃষ্টি যেন আঁকা হইয়া গিয়াছে; তাহার হাতে যেন এখন সেই কোমল অঙ্গুলির স্নিগ্ধ পরশ অনুভব করিতেছে—ফুলের মত আঙ্গুলগুলি কি এক অজানা সৌরভে যেন তার প্রাণ মন ভরিয়া দিয়াছে—আকুল আনন্দে সে বুঝি মূর্চ্ছা যায়!

ক্রমশ—

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by S. K. Chatterjee, Bani Press, 33A, Madan Mitter Lane, Calcutta.

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চতুর্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৩৩ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস,

১০।২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

# কল্লোল

চৈত্র, ১৩৩৩

# গজল গান

নজরুল ইসলাম

আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী !
খুলে দাও রং-মহলার তিমির-তুয়ার ডাকিলে যদি ॥
গোপনে চৈতী-হাওয়ায় গুল্‌বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাকছে ডালে কূ কূ ব'লে কোয়েলা-ননদী ।
পাঠালে ঘূর্ণী দূতী ঝড় কপোতী বৈশাখে সখি ।
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী ॥
তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি-তলে শিক্ত শরতে ।
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি ॥
পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী ।
তুহুঁ হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি ॥
ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর-কবি,
উষসীর শিস্‌-মহলে আসতে যদি চাস্‌ নিরবধি ॥

---
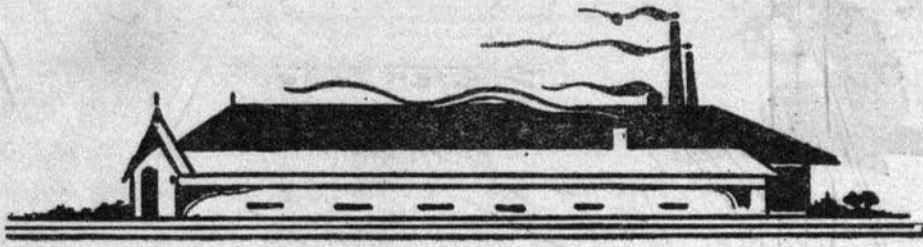
# পোষ্টাপিস

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

কি একটা সাপ্তাহিকের বুকে বিজ্ঞাপন দেখিলাম, একটা মধ্য-ইংরেজী স্কুলে হেডমাষ্টারের পদ খালি হইয়াছে।

কর্ম্মস্থলটী ঠিক হাতের কাছে নয়, রংপুরে। আপাতত পঞ্চান্ন টাকা বেতনে কাজে যোগ দিতে হইবে। বি,এ পাশ করিয়া এক বছর বসিয়াই ছিলাম, মাসে মাসে পঞ্চান্নটাকা অবহেলা করিতে পারিলাম না। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল না করিতে পারি আপনার ভারটাও ত' তা'র স্কন্ধ হইতে নামাইতে পারিব।

লম্বা দরখাস্ত পেশ করিয়া দিলাম।

জায়গাটাকে সহর অপেক্ষা গ্রাম বলিলেই বুঝিবার সুবিধা হইবে। মাঠের ধারে, পুকুরপাড়ে ছোট ছোট খড়ের ঘরগুলিকে স্রষ্টার নিজ হাতে গড়া শান্তি-নীড়ের মত মনে হয়। গাছ পালায়, ফলে ফুলে গ্রামটি যেন মুকুলিত যৌবনা এক শ্যামলা মেয়ে—

বাইশ বছরের একটা ছোক্‌রাকে হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইতে দেখিয়া প্রবীণ শিক্ষক-পণ্ডিতের দল বোধ করি প্রীত হইলেন না। তবু মনের আগুন মনে জালিয়া নিরুপায় হইয়াই তাঁরা এই মুণ্ডিত শ্মশ্রূ বালকের অধীনতা মানিয়া লইলেন।

হরিকালীবাবু স্কুলের একজন বিশিষ্ট কর্ণধার। আমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া একদিন স্কুলে আসিয়া বলিলেন, আমাকে তাঁহার গৃহ-শিক্ষক হইতে হইবে।

খাওয়াদাওয়া, থাকিবার বন্দোবস্ত, তার উপর আরও পাঁচটী টাকা তাহার পারিশ্রমিক। আপত্তি করিবার কিছু দেখিলাম না। স্কুলের আপিস ঘরে সতরঞ্চি পাতিয়া শয়ন করিতে হইত। সেখান হইতে বিছানা তুলিয়া হরিকালীবাবুর বাড়ীতে ফেলিয়া আসিলাম।

জীবনটা মন্দ লাগে না।

দুর্ব্বলতাবশত বা যে কারণেই হ'ক ছেলেদের গায়ে হাত তুলিতে পারি না। তাদের সহিত হাসিয়া দুই চারিটা কথাও বলি! প্রধান শিক্ষকের মুখে হাসি দেখিয়া ছেলের দল্ ঘন ঘন মুখের প্রতি চায়—মস্ত একটা অস্বা-

ভাবিক ব্যাপার! হরিকালীবাবুর ছেলে শশীচরণ এবং মেয়ে ইন্দুতারা আমার মধ্যে কঠোরতার অভাব দেখিয়া কিছুতেই আমাকে মাষ্টারের মত দেখিতে পারে না। আমিও সেটা চাই না, সুতরাং ভালই লাগে। তা'দের মধ্যে আমি দেখি আমার ছোট দুটী ভাইবোনকে—তারাই আজ এতদূরে আমার চোখে ইন্দু-শশীর রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে...জানিনা তারা তা'দের পলাতক দাদার কথা ভাবে কিনা।

একটা মাস কাটিয়া গেল।

স্কুলের 'পে বুকে' টিকিটের উপর পঞ্চান্নটাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যাহা পাইলাম গণিয়া তাহা কোনো উপায়েই ত্রিশের বেশী হইল না। ইহাই স্কুলের সনাতন রীতি—কর্ত্তারা আমায় প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন।

পঞ্চান্নটাকার সই দিয়া ত্রিশ টাকাই সব হেডমাষ্টার পাইয়া থাকে।

হরিকালীবাবুর বাড়ীর ঠিক সামনেই পেয়ারা গাছের তলায় তিনটা মেটে ঘর, শুনিলাম গ্রামের পোষ্টাপিস। একটা আপিস ঘর, অপর দুইটী ডাকবাবুর বাসস্থান।

সন্ধ্যাবেলায় ডাকঘরের গা-ঘেঁষা সরু রাস্তাটায় পায়চারি করিতেছিলাম। বিশেষ করিয়া এই সন্ধ্যা-বেলাটায় প্রিয়জনের অভাব মনকে পীড়া দেয়, আজও দিতেছিল,—

পিছন ফিরিয়া দেখিলাম এক শীর্ণ প্রৌঢ় সসঙ্কোচে ডাকিতেছেন। চোখে চশমা তৈরীর এক আদিনমুনা, পায়ে চটী এবং মোজা—মুখে চোখে দারিদ্র্যের অভিযোগ শীলমোহর করা। বয়সটা অনুমান করা কঠিন, তবে চল্লিশের কম বোধ হয় নয়।

গ্রামের পোষ্টাপিসের সহিত, অর্থাৎ খাম-টিকিটের সহিত সম্পর্ক কম-বেশী সকলেরই থাকে, কিন্তু তা'র অন্তরনিবাসী পোষ্ট-মাষ্টারের সহিত সংশ্রব থাকে অল্প মানুষেরই। আমারও ছিল তাই; পরিচয়ে জানিলাম ইনিই এখানকার ডাকবাবু।

তারিণীচরণ হাতজোড় করিয়া বলিলেন, মাষ্টার ম'শাই, একটীবার আমার কুঁড়েয় পায়ের ধূলো দিতে হ'বে—

বলিলাম, কিন্তু মাষ্টার মশাই বললে নয়। আমি আপনার ঢের ছোট, আর আপনিও ত' একরকম মাষ্টার—

তারিণীর মুখ চোখ দেখিয়া বোধ হইল কথাগুলা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

আমার উত্তর শুনিয়া তারিণীচরণ ভয়ে ভয়ে হাসিতে লাগিলেন, যেন ঐ হাসিটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আর কেহ যদি হেডমাষ্টারের সঙ্গে এমনি হাসিয়া কথা কহিতে দেখে তাহা হইলেই সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ছোট্ট একটী ঘর—মাটীর উপর চুণ লেপিয়া দেওয়া। দুইটী টেবিল, দুইটী কাঁটালকাঠের চেয়ার, একটা তেপায়া টুল—ইহাই আপিস ঘরের উল্লেখযোগ্য সম্পত্তি। তাহারই একটা টেবিলের উপর কালীমাখা একটা প্যাড ও কয়েকটী শীলমোহর পড়িয়া রহিয়াছে। টুলটার উপর মানানসই ভাবে বসিয়া তারিণীচরণ বলিলেন, রবিবারের দিনটে আর কাটতে চায় না! খেটে খেটে এমন অভ্যাস দাঁড়িয়েছে যে, না খাটলে মন কেমন করে।

বুঝিলাম ইহা আর একটা কিছু বলিবার অবতরণিকা। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, পিয়নটা একটা কাঁচের উপর কাগজ সাঁটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া গেল। তারিণীচরণ বলিলেন, নয়বৎসর আগে তিনি এই গ্রামে ব্রাঞ্চ পোষ্ট-মাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। এখানকার পোষ্ট-মাষ্টারকে টেলিগ্রাম, পার্শেল সব বিভাগই একেলা দেখিতে হয়, তাই গভমেণ্ট ন'টাকার বেশী এখানকার ডাকবাবুর জন্য মঞ্জুর করেন না। তাও কোনো কারণে তিনমাস মাহিয়ানার টাকা আসিয়া পৌছায় নাই। সেই মর্ম্মেই একখানা দরখাস্ত লিখিয়া দিতে আমায় ডাকা হইয়াছিল।

ভিতরে যাইবার দ্বারে একটা সুতা-সরিয়া-যাওয়া চট ঝুলিতেছিল। দরখাস্তখানা তখনো শেষ করি নাই, দ্বারান্তরালে কাহার আহ্বান শুনিয়া তারিণী উঠিয়া গেলেন। পরক্ষণেই একটা কলাই-ওঠা কলাইকরা বাটীতে উষ্ণ চা ও একটা ঝকঝকে রেকাবীতে খানিকটা হালুয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, কিন্তু দরখাস্ত লেখার মজুরী আমি চাই নি তারিণীবাবু—

তারিণীবাবু ভয়ে নীরব হইয়াছিলেন, পরদার আড়াল হইতে উৎসাহ পাইয়া বলিলেন, দরখাস্ত না লিখলেও আপনি এ মজুরী পেতে পারেন, যদি রোজ দয়া করে—

আপত্তি করিলাম না। যে অদেখা মেয়েটী স্বত-প্রবৃত্ত হইয়া এই অপরিচিতের জন্য আয়োজনটুকু করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁকে কি জানি কেন আঘাত দিতে পারিলাম না। যে বাড়ীর কর্ত্তা ন'টাকা মাহিনায় চাকরী করে, তা'দের দেওয়া চা হালুয়ার ভিতর পাইলাম অনাস্বাদিত এক মধু—যা' আমার এই দীর্ঘ পথহারা-জীবনে আর কোথাও মিলিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। স্নেহকরুণায় বা কর্ত্তব্যবোধে যে মেয়েটী তাদের সংসারের পক্ষে আজিকার মত এই অস্বাভাবিক আয়োজন করিয়া বসিল, ভাবিতেছিলাম তাহার ক্ষতিপূরণ সে কি করিয়া করিবে! তারিণীচরণ বলিলেন, চা খাওয়ার অসুবিধে এ সব দেশে ঢের। মাটার ভাঁড়ে করে চা' করতে হয়—

আমি এমন একটা কিছু ভাবিতেছিলাম যার জন্য তারিণীর কথার কোনো উত্তর দিলাম না!... তারিণীচরণ তামাক সাজিয়া হুঁকাটী আমার দিকে আগাইয়া করিয়া দিলেন! আপত্তি করিয়া বলিলাম, ওটী এখনো চলেনি ডাকবাবু।

ডাকবাবু বিস্মিত হইয়া হুঁকাটী নিজের মুখের কাছে টানিয়া লইলেন। কথায় কথায় শুনিলাম, তারিণীচরণের জন্মভূমি হুগলীজেলার কোনো এক গণ্ডগ্রামে। সেখানে তারিণীর জ্যেষ্ঠ সামান্য কিছু বিষয় আশয় নাড়াচাড়া করিয়া দিন কাটান। এণ্ট্রান্স দিবার পূর্ব্বেই, কবে যে প্রথম এই পোষ্টাপিসের দ্বারে মাথা দিয়াছিলেন তাহা আজ আর তিনি ঠিক মনে করিতে পারেন না। সেই হইতে এই দীর্ঘদিন বেদের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটিয়াছে—

পরদিন সন্ধ্যায় আবার কেন যে তারিণীর বাসায় গিয়া হাজির হইলাম তাহার একটা নিশ্চিত কারণও বোধকরি দিতে পারি না। হাতের হুঁকাটী নামাইয়া তারিণী বলিলেন, আসুন—এস, আমার মেয়ে তোমার কথাই জিজ্ঞাস করছিল—

বলিলাম, কলকাতার ছেলে চায়ের নেশা ভয়ানক। কাজেই আপনার এখানে—

আমার হাতে একটা বাঙলা সাপ্তাহিক ছিল, তারিণীচরণ সেটা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, বঙ্কিম মারা গেছে না? বেড়ে লিখ্‌ত!—কবে মারা গেল?

বলিলাম, তখনও আমাদের অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে ছিল না—

তারিণীচরণ বিমর্ষভাবে কাগজখানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। আমি বসিয়া ষ্ট্যাম্পমোহর ক'টা প্যাডের উপর ঠুকিতে লাগিলাম।

এটা অপনারই লেখা বুঝি?

বলিলাম, ঐ করেই দিনকাটাই, জিনিষটা বেওয়ারিশ কি না!

না, চর্চ্চা রাখা ভাল, আমাদেরও—ভাবনার মধ্যে তাঁর শেষ কথাটা হারাইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদেরও—?

আমাদেরো আইডিয়া ছিল বহুৎ—কেরাণী-সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ মক্‌স করতুম।

... আমার মেয়ে এই লেখা-লিখি ভারি ভালবাসে। তোমার লেখাপত্তর এনে ওকে পড়তে দিও, সময় কাটবে ওর—

এই বিদেশে আসিয়া পাঠিকা সংগ্রহের ভিতর গৌরবের চিহ্ন খুঁজিয়া পাইলাম, বলিলাম, বেশ, কালই আমার লেখার বস্তা খালি করে—সে তা হ'লে বিস্তর!

ষোল বছর থেকে এই রোগে ধরেচে। তারপর এই ছটা বছর ত' শুধু লিখেই কেটেচে। পড়ার খোঁজও বিশেষ ছিল না।

স্কুলের প্রাইজের জোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকায় পোষ্টাপিসে আর যাওয়া হয় নাই। লেখাগুলা পাঠাইয়া দিয়াছি। ... তারিণীর মেয়ে আমার লেখা পড়েন—ভাবিতে ভারি আনন্দ হয়। তাহাকে কোনোদিন দেখিব কিনা জানিনা!

প্রাইজের পর সোমবার স্কুল বন্ধ ছিল। গ্রীষ্মের

অলসমধ্যাহ্ন বেলাটা ভারি বিরক্তকর ঠেকিতেছিল। আস্তে আস্তে ডাকঘরের উদ্দেশে রওনা হইলাম।

আপিস-ঘরে তারিণীকে না দেখিয়া ফিরিতেছিলাম, ডাকহরকরাটা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

জীবনে বোধহয় তার চেয়ে বিস্মিত কখনো হই নাই। তবু, তারিণীর অদেখা কন্যার ডাক অবহেলা করিতে পারিলাম না।

পরদার ভিতরে যাইবার সেই আমার প্রথম অধিকার।

ঝরঝরে মেটে র'কটীতে তারিণীর মেয়ে আসন পাতিয়া দিল। বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম—জগতের সবক'টী নর-নারী এক স্নেহনীড়ের ভিতর পাশাপাশি যদি থাকিত! তারিণীকে না দেখিয়া ফিরিবার সময় দু'পহরের যে রৌদ্রটা ভারি তিক্ত ঠেকিয়াছিল তাহাই এখন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

তারিণীর মেয়ে আমার লেখাগুলি ঘর হইতে আনিয়া, সামনে বসিয়া বলিল, বাবা কতদিন আমায় আপনার সামনে যেতে বলেছিলেন—

কোনো জবাব দিলাম না, নীরবে তার সামনে আসাটুকু কৃপণের মত উপভোগ করিতেছিলাম।

—পোষ্টাপিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আসবেন, বাবা তাঁকে এগিয়ে আনতে গেছেন। ততক্ষণ আপনার আলোচনা করি।

লজ্জা বা লজ্জাহীনতার আড়ম্বর কিছুই তার মধ্যে দেখিলাম না। সে যেন আমার অনেক দিনের আপনার, তাকে কাছে পাওয়াই স্বাভাবিক, দূরত্বটাই তার-আমার মধ্যে কৃত্রিম! মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটী সূক্ষ্ম এয়তির চিহ্ন তার ললাটে আঁকা।

এই প্রথম পরিচয়েই আমার লেখা সম্বন্ধে তারিণীর মেয়ে যা' বলিল তা কোনো লেখকের পক্ষেই গৌরব-জনক নয়। মনে হইল সে-ই সত্য বলিয়াছে, এতদিন খেলাই করিয়াছি। তাহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না, আপনার অযোগ্যতার জন্য একটু দুঃখ হইল! পুরুষের দরবারে যে অবিমিশ্র প্রশংসার আসন আমার ছিল—এই পল্লীর মেয়েটী সে আসন আমায় দিল না।

সন্ধ্যার পর তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কোথায়?

প্রশ্নটা আমার পক্ষে অনুচিত হইয়াছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়াও পারি নাই। তারিণীচরণ চোখ হইতে চশমাটা নামাইয়া বলিলেন, হাঁ সে কথা তোমায় বলি নি—ঠিক বল্‌বার মত নয়। বছর চারেকের কথা—এইখান-থেকে মেয়েটীর বিয়ে দিলাম, এই দুচারটে ষ্টেশন আগে। মাস দুই ঘর করেছিল বোধহয়, তারপর তারা পাঠিয়ে দেয়, আর নিয়ে যায় নি। বয়েসে বাবাজী বোধহয় আমার চেয়ে বড়, মেয়েটীকে বন্ধুবান্ধবের সামনে বেরিয়ে গান বাজনা করতে বলেছিলেন; সে রাজী হয়নি। তাই তাঁরা মেয়ে আর নিয়ে যান নি। আমিও পাঠাতে ব্যস্ত নই।

ঐ শুষ্কশীর্ণ লোকটা যে কোনো স্থলে অতখানি শক্ত হইতে পারে স্বপ্নেও আমি তাহা ভাবি নাই! ভারাক্রান্ত মন লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তারিণীর সহিত মিশিয়া তাঁর কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে একটু ধারণা জন্মিয়াছিল। তাই সে দিন তারিণী যখন হঠাৎ জ্বরে পড়িলেন তখন তাঁর কাজটা জোড়া-তাড়া দিয়া আমিই কোনোমতে চালাইতে লাগিলাম। তারিণী একটা করিয়া সই করিয়া দিতেন। পোষ্টাপিসের জন্য স্কুলে কাজে ছুটী লইলাম। তিন দিন পর তারিণীর জ্বর কমিয়া আসিল।

তারিণী মেটে ঘরের জানালা দিয়া বাহিরের দিকে স্তব্ধভাবে চাহিয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিলাম। বহুক্ষণ অসংলগ্ন দৃষ্টিতে মুখের প্রতি চাহিয়া তারিণী তাঁর অস্থিসার হাত দিয়া আমার হাতদুটী বুকের কাছে টানিয়া লইলেন... এমনিভাবে খানিক থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, চারবছর আগে যদি তোমার দেখা পেতুম অমল! তা হ'লে মেয়েটার আজ...' অশ্রুবাষ্পে কথাটা অসমাপ্ত রহিয়া গেল! আমারও দুটী চোখ জলে ভরিয়া আসিল। ভাবিলাম মানুষকে মানুষ যত পঙ্গু করিয়াছে

চিকিৎসা শাস্ত্রের কোনো রোগই ততদূর পারে নাই।

ঘর হইতে বাহির হইতেই তারিণীর মেয়ে বলিল, আপনার লেখাগুলো নিয়ে যাবেন,—আর বাবা এখন বেশ ভাল হ'য়েছেন—

নিঃশব্দে বিদায় লইলাম। যে একদিন স্বেচ্ছায় আমায় ভিতরে প্রবেশের অধিকার দিয়াছিল সে-ই আজ মুক্তদ্বারে আগল দিয়া দিল।—

মেটে ঘর দিয়া অন্ধকার রাতে ক্ষীণ আলোর শিখা পথে আসিয়া পড়ে, আমি তারই দিকে চাহিয়া থাকি। সেই আলোর ধারা অনুসরণ করিয়া এক বিচিত্র রহস্যময়কে বিশ্লেষণ করিতে চাই। হেডমাষ্টারী আর ভাল লাগে না। হঠাৎ যাদু পরশে আমার জগৎ যেরূপে ভরিয়া উঠিয়াছিল তেমনি হঠাৎ সেটা শুষ্কশূন্য বৃদ্ধ হইয়া গেল!—

সেদিন হরিকালীর ছেলে শশীকে মারিয়া বসিলাম। শশী কাঁদিতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া দেখি তারিণীচরণ আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া তারিণী বলিলেন, আমার মেয়ে তোমায় একবার দেখা করতে ডেকেচে অমল।...

দুর্জ্জয় অভিমানে আমার বুক ভরিয়া গেল—আমি কি একটা খেলার বস্তু! কিন্তু বেশীক্ষণ আমাকে পোষ্টাপিসের দ্বারের বাহিরে রাখিতে পারিলাম না।...

দেখিলাম তারিণীর মেয়ের হাত নিরাভরণ। সে আমায় প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—বাড়ী যাচ্ছ?

উৎসাহশূন্য হাসির সহিত তারিণীর মেয়ে বলিল, বাড়ীই বটে। দেওর নিতে এসেচে—এখনও নাকি দাহ হয়নি। মুখাগ্নি দিতে হবে।

ভাবিলাম, ইহার সহিত আর কখনো দেখা হইবে না, কোথায় কি ভাবে সে থাকিবে—তাহা আমি জানিব না। ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মতই যে আমার জীবনের আঙ্গিনায় আসিয়া পড়িয়াছিল—আজ সে...

সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গেলাম।—

আমার লেখার পাশে কয়েকটী অভিমত আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন ছাড়া তারিণীর মেয়ের আর কিছুই আমার কাছে রহিল না!

প্রায় প্রত্যহই তারিণীর কাছে যাইতাম। পাড়া-গাঁয়ের স্কুলের হেড্ মাষ্টারের কোনও কাজ থাকে না। রাত্রে তারিণীর ঘরে বসিয়া কাটাইতাম।

মাঝখানে কাগজের তালি দেওয়া লণ্ঠনটা জ্বলিত। দুজনের মুখ আড়াল করিয়া থাকিত। তারিণী আমার মুখ দেখিতে পাইত না, আমি তারিণীর মুখ দেখিতে পাইতাম না।

হেড্মাষ্টারী ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তারিণীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলাম না।

---

# খাখ্
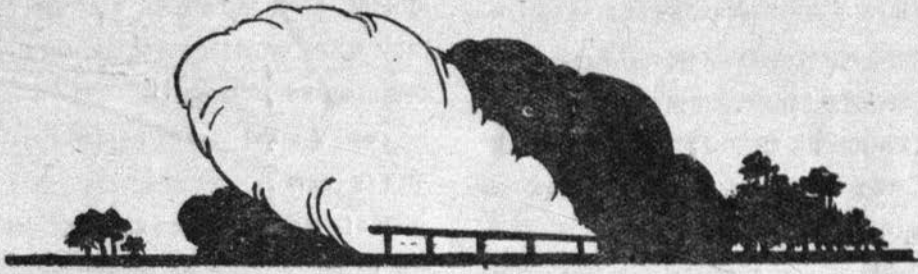
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছোটার সে কী কদম,—মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আর কি!

হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলে এসে বল্লে—সেই ঝাঁক্‌ড়ার মাঠ চিন্‌তিস্ মা?—সেই ভেলুর হাটে চ্যাঙারি ক'রে মাছ বেচ্‌তে নিয়ে যাবার বেলায় পথে পড়্‌ত?—সেই যে রে অশথ্‌পোতার—

মুমূর্ষু মা শুধু বল্লে—হ্যাঁ,—

আর বল্‌তে পারে না, দাঁতের ফাঁকে কথা বুঁজে আসে। ঠোঁটের কোণ্ বেয়ে থুতু গড়ায়।

ছেলে বল্লে—কোথা থেকে সব সাহেব-সুবো এসেছে মা,—সব ফিতে ফেলে ফেলে মাঠ মাপ্‌ছে। আর সঙ্গে বিস্তর কুলি-ধাঙড়,—প্রায় দু' তিনশ'।—গাঁইতি নিয়ে সব মাটি খুঁড়্‌তে লেগেছে।

মা চিবুকটা তুলে জিজ্ঞাসু চোখে শুধু তাকায় মাত্র।

—রাস্তা কাট্‌ছে রে—সড়ক। হাটে যেতে আর হোঁচট্ খেতে হবে না,—মনে আছে, সেই যে রে গাছের শেকড়ে পা থেঁৎলে ধুম্ করে' পড়ে' গেছ্‌লি,—জ্যান্ত কই মাছগুলি ধামা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেছ্‌ল—?

ব'লেই ছেলের খিল্ খিল্ করে' হাসি।

—আমাদের নব্‌নে হেবোও কোদাল নিয়ে কোপাতে লেগে গেছে। ছিদাম পর্য্যন্ত;—কোপাতে তো পারেনা, শুধু, মাথায় ধামা করে' মাটি তুলে নিয়ে ওপারে এনে ভুর্ করছে।

দুব্‌লা মা ছেলের ক্ষুদে হাতখানি নিজের খস্‌খসে বিবর্ণ হাতের উপর টেনে এনে বোঁজা গলায় বল্লে—বাজারে গেছ্‌লি?

—না মা। কাল রাতে তো মোটে একটা মাত্র শোল্ মাছ শুধু আট্‌কা পড়্‌ল। তাই নিয়ে দুপুর দুটো পর্য্যন্ত তো বসে' থাক্‌তাম,—বিকৃত না। আর,—কত-তেই বা বিকৃত?—বড় জোর তিন পয়সা। বাজারেই যাচ্ছিলাম, ওদের মাটি কোপাতে দেখে ফিরে এসেছি মাঝ পথ থেকে। আমিও মাটি কোপাব মা।

মা কথা কয়না, ছেলের হাতের রোগা আঙুলগুলি নিজের শিথিল মুঠির মধ্যে একটু জোরে চাপ্ দিতে চেষ্টা করে।

—নব্‌নে বল্লে, যে পয়সা মিল্‌বে, তোর মাছ বেচার চেয়ে ঢের বেশি। ছিদামের কী সে ফুর্ত্তি!—বলে কিনা, পয়সা পেলে বাবুদের মতো রোমাল্ কিন্‌বে,—মাথায় বাঁধ্‌বে। আর একটা খেল্‌না হাতঘড়িও নাকি। আমি কিন্তু তোর জন্যে ওষুধ কিন্‌ব মা,—কব্‌রেজের ঠেঙে। ব্যাটা আবার পয়সা না হ'লে ওষুধ দেয়না।

মা'র হাড়-বের-করা ভাঙা গালের ওপর একটু হাত বুলিয়ে পরে বল্লে—যাই মা আমি?

মা'র করুণ নীরব দুই চোখে সম্মতি ভেসে ওঠে হয়ত,—ছেলে ছুট্টে বেরিয়ে যায়।

আবার তক্ষুনিই ঘরে ঢুকে বল্লে তাড়াতাড়ি—ডুলার মধ্যে শোল্ মাছটা রইল মা। কুসি-মাসী এলে ওকে রাঁধ্‌তে বলিস্। ওটা আজ আমিই খাব,—আর মাসী যদি কিছু ভাগ রাখ্‌তে চায় বৈকির জন্য, তো যেন রাখে। তুইও একটু খাস্,—কী হবে খেলে?

আবার ছুটে যায়।

উঠোনের ও-পাশ থেকে বৈকি বলে—কোথা যাচ্ছিস্ রে ভোম্‌রা?

ভোম্‌রা কানও পাতেনা। দৌড়ে চলে। যেন হাওয়ায় কে একটি পালক উড়িয়ে দিয়েছে। পাত্‌লা পালক,—ফুর্‌ফুরে পালক।

যেন একশোটা ভেলুর হাটের সোর।

দু' কিনারে দুটো নারকেলের দড়ি টান্ করে' ফেলে মাঝে একের পেছনে এক—এক দঙ্গল কুলি মাটি কোপাতে লেগেছে সার বেঁধে।

কাছাকাছি গাঁয়ের বৌ-মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘোম্‌টা টেনে ঘর থেকে আল্‌গা হয়ে মাঠে বেরিয়েছে কাণ্ড দেখ্‌তে। এত লোক এক সঙ্গে দেখাও নাকি পুণ্যি!

নব্‌নে বল্লে—ড্যানার শির্‌গুলো কেমন ফুলে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছিস্—নীল।

কার্ত্তিক বল্লে—মাটি কুবিয়ে সুখ আছে ভাই। বুকের ছাতি নাচে তালে তালে। ঐ যে সব গরুর গাড়ী এসে পড়্‌ল। ইঁট সুর্‌কি বুঝি? পাত্‌লা ক'রে কোপাস্ কিন্তু রে।

ছিদাম ধামায় ক'রে গুঁড়ো মাটি তুলে মাথায় নেয়,—আধা পথে এসে ধামাটা ভোম্‌রার মাথায় বদ্‌লি করে। খানিকটা এগিয়ে মাটিগুলি থুব্‌ করে' থুয়ে ভোম্‌রা ফের ফিরে আসে ডালাটা ফের মাথায় নিতে,—ওর বুকটা ফোলা, কপালটা জল্‌জ্বলে।

ফের মুখোমুখী হতেই ভোম্‌রা বল্লে—কত পাওয়া যাবে রে ছিদাম?

ছিদাম মাটি-মাখা দু'হাতে বুকের ঘাম মুছে বল্লে—যাই যাক্!—বাজারে বিকির জন্য পিত্যেশ্‌ করে' ব'সে থাকার চেয়ে ঢের ভালো!

ছিদ্দাম খড়্‌কে বেচে,—পাঠখড়ি, সল্‌তে, চর্‌কার সুতো। কত আর বিকোয় এ সব?

আবার দেখা হতেই ছিদাম বল্লে—কোবাতে পার্‌লেই বেশি পয়সা। দেখ্‌ছিস্ না দড়ির খাট ছেড়ে বুড়োরাও পর্য্যন্ত কোদাল নিয়েছে। আমাদের এই বেশ,—দেওয়া আর নেওয়া।

—আমরা বন্ধু।

সারা শৈশবের মারামারির কথা ভুলে' যায়,—পুকুরে পরস্পরকে চুব দেবার কথা। দুজনে দু'জনের ঘেমো বুক দুটোর দিকে চেয়ে হাসে। আকাশের রোদ দু-জনেরই ভিজা গায়ে পিছ্‌লে পড়েছে একই মা'র স্নেহের মতো!

এক একটা কোদাল মারে, আর বুড়ো পেসাদের পাঁজ্‌রার হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। লিক্‌লিকে হাঁটু দুটো দুম্‌ড়ে ভেঙে পড়্‌তে চায়, মাজাটা যেন কে মোচ্‌ড়ায়, চিবোয়। তবু কোদাল মারে,—মাটির নীচেই মজুরি।

বেশিক্ষণ পারে না, হাঁপায়। কল্‌কেটা ধরিয়ে বুড়ো আঙুলের ফাঁকে নিয়ে পাশে বসে' টান দিতে লাগ্‌ল, গর্ত্ত থেকে চোখের ড্যালা দুটো যেন বেরিয়ে আস্‌বে ঠিক্‌রে। পেসাদ যেন উত্তরে শ্মশানে যাবার পথে মাঝে অশথ্‌-পোতায় একটুখানি জিরিয়ে যেতে বসেছে।

ঠিকাদার ট্যাস্ সাহেব সিগারেটের ছাইটা বুড়োর মাথার ওপর ঝেড়ে ফেলে পালিশ্-করা বুট্টার চোখা ডগাটা বুড়োর মেরুদণ্ডের ওপর ঠেকাল,—সচেতন করে' দিতে হয়ত, গাফিলির জন্য শাসন করতে।

তাইতেই—

ফেরবার সময় আর ঢুলকি তালে নয়, ঢিমিয়ে চলে,—জিরিয়ে জিরিয়ে।

—মাগো, ছটা পয়সা পেনু,—পুরো দিন গুজ্রালে ছ'নো।

মা'র চোখের কালো কোণে খুসির একটু ছোপ পড়ে। হাতখানি বাড়িয়ে দেয় শুধু।

—একটা কর্‌করে একানি আর ছটো পয়সা। নব্‌নে বল্লে, আনিটা ঐ বছরের, একেবারে আন্‌কোরা। ঐটা রেখে দেব মা, খরচ করবনা।

পরে বিছ্‌নার ধারে বসে' ব্যাজার মুখে ভোম্‌রা বল্লে—জানিস্ মা, বুড়ো পেসাদটা মরে' গেছে?

বিমার মা হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—কি বল্‌ছিস্?

—নব্‌নে ওরা তো বল্লে ওর পিঠের হাড়ে অনেকদিন থেকেই নাকি ঘুন্ ধরেছিল,—জর হোত! মাটি কোবাতে গিয়েই বুকের ফেঁপ্‌রা নাকি ফেটে গেছে। তা নয় মা, সাহেব-বাঁদরটা ওকে লাথি মেরেছিল।

কুসি-মাসী তেড়ে এসে বল্লে রুখে—মারবেনা? একশো বার মারবে, সাহেবের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে গেছ্‌ল কেন? কেন?—কাজে গলতি হলে মারবে বৈকি!

বেরিয়ে যেতে যেতে কুসী-মাসী বিড়্‌বিড়্ ক'রে বল্‌ছিল—বুড়ো বয়সেও লুকিয়ে ভাতার-গিরির সখ্ মিটেছে এবার,—মর্ মর্—

ভোম্‌রা বল্লে—সেই মাঠ থেকেই ওকে শ্মশানে নিয়ে গেল। ছনিয়ায় ওর কেউই নেই কিনা;—তুইও একটি বার দেখ্‌তে পেলি না। হোগ্‌লা জড়িয়ে পাটের রসি দিয়ে ওকে বাঁধ্‌লে ওরা,—নব্‌নেটার যেন বেজায় ফুর্ত্তি। এক একটা হেঁচ্‌কা টানে গেরো মারে, আর হাসে। একটুও দয়া মায়া নেই—বলে, চিতায় চড়িয়ে মট্ মট্ করে' হাড্ডিগুলো সব ভেঙে দেব বুড়োর।

চোখের জল মোছেনা, মা'র বুকের ওপর হাত রেখে বলে—মা, সাহেব-শূয়ারটার মুখে থাব্‌ড়া বসিয়ে কেউ দিলে না? আমার ইচ্ছে করছিল, মারি পেসাদের কুড়োলটাই বেটার মাথায়। লুকিয়ে এক গাদা থুতু বেটার কোটের ওপর ছিটিয়ে দিয়েছি,—বাড়ী গেলে টের পাবে।

মা'র মুখের কাছে মুখ এনে বল্লে তারপর—তুই এত কাঁদ্‌ছিস কেন মা? পেসাদ তো বুড়ো,—একদিন তো যাবেই। আমি গেলে বরং—

ছেলেও মা'র পাত্‌লা চিমটে বুকটার মধ্যে মাথা গুঁজে ফুপ্‌তে লাগ্‌ল।

মা মারা গেল,—পেসাদের পিছু পিছু,—ছ'দিন বাদেই।

নব্‌নে এল হোগ্‌লা আর রসি নিয়ে, কুসি-মাসী একটা শালুর কাপড় গায়ে চড়িয়ে দিলে। যে হরির নাম সারা জন্মে কেউ নেয়না ভুল ক'রেও,—সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে আজ,—হরিবোল্। ডাকটা আকাশ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় যেন।—প্রার্থনা নয়, প্রতিবাদ।

বেড়ায় গোঁজা গাবের আঠায় কালো করা একটিমাত্র খেপ্‌লা জাল,—ঝাঁকি জালও নয়। তাও পুঁজ্‌রা,—পচা। আর মুলি-বাঁশের মাচার তলায় গর্ত্ত করে' একটা ভাঁড় পোঁতা,—তাতে, গুনে' দেখা গেল সাড়ে এগারো আনা পয়সা। আর ট্যাঁকের সেই নতুন বছরের কর্‌করে আনিটা,—এতদিন ধরে' ট্যাঁকেই আছে।—

সমস্ত জীবনের এই মূলধন।

পায়ের তলে রুক্ষ বৈরাগী পথ,—আর ওপরের ফাঁকা ফতুর বাউল আকাশটা।

তেম্‌নি বেঁকী শুধোয়—কোথা' যাচ্ছিস্ রে ভোম্‌রা? এবারে কান পাতে, কিন্তু জবাব দেয়না। চলে,—

ছুটে নয়, উদাসের মতো;—নাখুস্। পিঠের উপর দু'টি হাত জোড় করা। মাঝে মাঝে অকারণে পথের আগাছা-গুলো টেনে টেনে ছেঁড়ে,—আকাশের দিকে উঁচুয় ছুঁড়ে মারে, হাওয়ায় উড়ে ফের্ মাটিতে পড়ে। লাথির পর লাথি মেরে গোঁয়ারের মতো শুকনো মাটির ঢেলাগুলোকে ভাঙে, গুঁড়োয়। ডালের পাখীগুলিকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়ায়, কারো পাথায় লাগ্‌লে হাততালি দিয়ে ওঠে।

পা চালাতে চালাতে শ্মশানের কাছে এসে পড়েছে—একধারে দুটো সজ্‌নে গাছ পাতা-ঝরা হ্যাংলা ডাল মেলে'। যেখানে পেসাদকে পোড়ানো হয়েছিল সে জায়গাটায় একটা গেঁদেলের ঝাড়,—সেখান থেকে মা'র চিতাটা ফারাক্।—তাতে একটা নাবালক তুলসীগাছ, একরত্তি।

ভোম্‌রা থক্ থক্ ক'রে একগাদা থুতু ছিটিয়ে লাথি মার্‌তে মার্‌তে বল্লে—নরকের উনুনে চেলাকাঠের বদলে তোর মুণ্ডুটা যেন ঢুকিয়ে দেয়, তুই মর্।—তুই মর্‌লি বলেই তো মা মর্‌ল।

বিগত আত্মার উদ্দেশে তর্পণ নয়, তড়্‌পানি,—ফুল নয়, থুতু।

—তুই শালা আর কেন দু'দিন সবুর ক'রে গেলি না? আর দু'দিন পরেই তো একটা টাকা হ'লে কব্‌রেজের ঠেঙে পাঁচন আন্‌তে পার্‌তাম! নিজে তো মা'কে একটি আধ্‌লাও দিস্‌নি, অথচ মা তোকে রোজ ভেট্‌কি মাছের ঝোল রেঁধে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে,—আমিই দিয়ে এসেছি।

বলে, আর গেঁদেলের ঝোপ লক্ষ্য করে' ঢিল মারে।

আবার তেম্‌নি ব্যাজার মুখে চলে,—এ-পাশ ও-পাশ, কোথাও যেন যাবার জায়গা নেই। মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে যা সাম্‌নে পায়, তাতেই বাড়ি মারে। চোরকাঁটাগুলো হেলে পড়ে, ধ্বনের শীষ্‌গুলি মচকায়। যাকেই মারুক, মনে করে পেসাদকেই চাবকাচ্ছে যেন।

মা'র চিতার কাছে বসে' এক ফোঁটা চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলে না। দোহাত্তা খালি কাঠিটা চালায়,—হঠাৎ শেষটায় একটা বাদাম গাছের গায়ে লেগে কাঠিটা দু'খান্ হয়ে গেল।

তুমুল তোল্‌পাড়,—এগিয়ে এসে দেখে,—অশ্বত্থগাছ-টার গোড়ায় কুড়ুল পড়েছে।

যেন শিকড়ে শিকড়ে হাহাকার, শাখায় শাখায়;—শুক্‌নো হল্‌দে খসা-পাতায় মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস যেন। মাটির তামাম বুক যেন বেদনায় টন্‌টন্ করে' উঠেছে।

যুগযুগান্তলালিত বৰ্দ্ধিতায়তন সংস্কারকে যেন এক নিমেষে টেনে হিঁচড়ে উপড়ে ছারখার করে' দেবে—

ডালগুলো সব কেটে ফেলা হয়েছে, গাছটা এখন একেবারে ন্যাড়া, ব্যাজার,—গরীব। খালি ধড়টা আছে, আর গোটা কুড়ি ঘা পড়লেই মড়মড় করে' উঠ্‌বে। অনাথ ছেলের মতো গাছটা নীরবে কাঁদ্‌ছে।

পাখীর বাসাগুলি পড়ে' গেছে, বহু ডিম চুরমার্ হয়ে গেছে,—শিশু পাখীগুলি উড়তে না পেয়ে চেপ্‌টে মারা গেছে। যারা পালাতে পেরেছে, তাঁরা চেঁচিয়ে দুর্ব্বল পাখার ঝাপট্ দিয়ে এই উদ্ধত হত্যার বিরুদ্ধে অস্ফুট প্রতিবাদ কর্‌ছে। কেউ কেউ চেনা বাসার সন্ধানে উড়ে গিয়ে ফের ফিরে এসে গাছের গুঁড়িটায় ঠোঁট্ ঘষ্‌ছে,—অস্থির, অসহায়।

ধূলোর একটা ঘূর্ণি হাওয়া উঠ্‌ল।

তারপর—

এমন চীৎকার ভেলুর হাট তার জন্মে শোনে নি। শুধু কানে তালা লাগে না, বুক বন্ধ হয়ে আসে।

মানুষের চীৎকার নয়, গাছের।—শিবঠাকুরের মতো নাদুস্-নুদুস্ বুড়ো জটাওলা অশ্বত্থগাছটার।

মনে হয়, সমস্ত আকাশ যেন খালি হয়ে গেছে, মাঠটা যেন সদ্য-বিধবা। কি যেন নেই,—প্রকাণ্ড পরিবারের বুড়ো জ্যাঠামশায়,—সব তাই মুখভার্। গাছের ছায়াটি পর্য্যন্ত ঘুচে গেল,—ছায়া তো নয়, রাজসিংহাসন।

নব্‌নে কুড়ুল নিয়ে লাকড়ি ফাড়্‌তেই লাগ্‌ল। কিছুতেই যেন হুঁশ নেই।

দুঃখী ছেলের মতো ভোম্‌রা বল্লে—রাস্তাটা একটু বেঁকে ঘুরিয়ে নিলেই হোত, খামোকা—

কাত্তিক বল্‌লে ঘাড়ের ঘাম মুছে—শুধু কি রাস্তাই নাকি রে বোকা, এখানে—এদিকটায় সব আপিস্ হবে। এ বাবা সাহেবের হুকুম।

বেঁকি পর্য্যন্ত ঝুড়ি করে' শুক্‌নো পাতা লাক্‌রির কাটা টুক্‌রো কুড়োতে লেগেছে। এসে বল্‌লে—কুড়ো না ভোম্‌রা, দু জনে অনেকগুলি হবে।

ভোম্‌রাও কুড়োতে লাগল। বেঁকি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে' বল্লে—কাল মা তোকে ঠেঙিয়েছে, মন খারাপ করিস্‌নে,—লুকিয়ে আমি তোকে গোলাপজাম খেতে দেব,—এতগুলো, এক ডালা। মা জান্‌তেও পাবে না।

শিশুর অভিধানে তাকে চুম্বন বলে না। কিন্তু আর কতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেই দুটি নিকটতম বুকের উত্তাপে গানের সুরের মতো তারা ফুট্‌ত আকাশে,—অগণন, অনির্ব্বচনীয়।

তারপর দুটি বুক ফের দূরে সরে' গেলে চোখের জল চুম্বনের চেয়েও মিঠা লাগ্‌ত।

লাক্‌রির একটা খোঁচা লেগে ভোম্‌রার আঙুল কেটে রক্ত গল্‌তে লাগ্‌ল। তক্ষুনি বেঁকি কাটা আঙুলটাকে মুখের মধ্যে পুরে ঠোঁট দিয়ে চুষ্‌তে লাগ্‌ল। ফের আঙুলটা বের করে' ফেলে ছুটে দূর থেকে গাঁদার পাত ছিঁড়ে হাতের তেলোয় চট্‌কে জখমি আঙুলটার ওপর চেপে ধর্‌লে। বাঁধবার কোনো ন্যাক্‌ড়া না পেয়ে বল্‌লে —বুড়ো আঙুলটা দিয়ে টিপে চেপে রাখ। ধর্।

বেঁকি মাথায় করে ঝুড়িটা নিয়ে বল্‌লে—ঘরে চল্।

ভোম্‌রা ফাড়া' গাছটার ওপর চুপ করে' বসে' থাকে আঙুলটাকে টিপে ধরে'। সবাই যে যার ঘরে চলে' গেছে। অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্টি হয়ে আস্‌ছে,—লক্ষ্য নেই।

মা তো নেইই,—গাছটাও নেই।

সাত বছরে যা, সতেরো বছরেও তাই,—যেমন কে তেমন; বাড়ে না একটুও। মা'র হাতে পোঁতা উঠোনের পিয়াল গাছটা পর্য্যন্ত কত বড়টি হোল! সেই দিনের বেঁটে গাবগাছটা আজ কতখানি ঢ্যাঙা,—জোয়ান্ হয়ে উঠেছে।

ছিদাম বেড়েছে ফন্‌ফনে লাউ ডগাটির মতো। বেঁকি তো নয়, অগুন্তি ফুলে ফুলন্ত শেফালির একটা ডাল।

গোঁফের রেখা দেখা দিল, বুকের ছাতিটাও ফুল্‌ল, উরু দুটোও চওড়া হোল,—কিন্তু লম্বায় সেই আড়াই হাত-ই। যে কুল ছিদাম হাত তুলেই পাড়ে, সে-কুল পাড়্‌তে ওর আকৃশি লাগে। বেঁকির মুখের দিকে চাইতে হলে ঘাড়টা অনেকখানি ঠেলে তুল্‌তে হয়,—বেঁকির মুখ যেন আকাশের তারা।

সবাই ক্ষেপায়। কেউ বলে—লাট্টুর আল্; কেউ বলে—পাঁঠার শিং; কেউ বা বলে—হোঁদল কুৎকুতে! নামটা সংক্ষিপ্ত করে' অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে—ভোম্।

গলার শিরগুলো গোল হয়ে ওঠে। শত্রুকে আক্রমণ কর্‌তে হলে একেবারে বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়াতে হয়,—দূর থেকে ঘুষি নাগাল পায়না। তার আগেই ওরা ওদের লম্বা ঠ্যাং দিয়ে ল্যাং মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দেয়।

কদম-গাছটার তলায় এসে উপুড় হয়ে ডন্ দেয়, ওঠ্-বোস্ করে। শোয়ানো ডালটায় একটা দড়ি ঝুলিয়ে দু-ধারে দুটো হাত এঁটে বেঁধে শূন্যে ঝোলে,—হাত দুটো ছিঁড়ে পড়তে চায়,—কিন্তু তবুও একটুও ঢ্যাঙা হয় না,—এক ইঞ্চিও না।

ঘাসের ডগাটা পর্য্যন্ত বাড়ে,—বেঁকির হাতের আঙুলগুলিও লতিয়ে লতিয়ে কেমন বাড়্‌ল,—চুল, চোখের পাতার পালকগুলি।

কুসি-মাসী ভাঙা কুলোটা দিয়ে পিঠে এক বাড়ী মেরে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্লে—বসে' বসে' গিল্‌বে খালি, গাড়োল, পাঁঠার শিং! দেখ্‌তে ত' বুড়ো আঙুলটি,—খাবার বেলায়—

মা'র ছেঁড়া, জায়গায় জায়গায় গেরো-মারা খেপ্‌লা জালটা নিয়ে ভোম্‌রা বেরুল;—বোয়ালপুকুরের ধারে।

খেপলাজালে কি বোয়াল মাছ আট্‌কাবে? যদি আট্‌কায়!

গরুর গাড়ী করে' মাটি আস্‌ছে। বোয়াল-পুকুরের আধখানারও বেশি বোঁজা। বাকি জলটুকু মুমূর্ষু মা'র অশ্রুর মতোই টলটল্‌ করছে।

নব্‌নে বল্লে—এখানে সব বস্তি হবে। কুলিদের।

ওর কী নিদারুণ উৎসাহ! গাড়ী তো হাঁকায়-ই, কোদাল দিয়ে দিয়ে মাটিগুলি টেনে, ফেলেও।

ও যেন ঠিক মানুষ নয়, ছ্'পেয়ে একটা বুনো মোষ। শ্রমসহিষ্ণু বলিষ্ঠ দেহটায় দুর্নমনীয় দৃঢ়তা!

বাকি জলটুকুতেই ভোমরা জাল ফেল্‌লে। একটা মলন্দি মাছ পর্য্যন্ত নয়।

কাত্তিক একটা মাটির ঢেলা নিয়ে তেড়ে এল—বেরো আটকুঁড়ির বেটা,—পায়ের কড়ে আঙ্‌ল, টুঁটো কোথা-কার! জাল ফেল্‌ছেন? বেরো।

তারপর জালটা কাঁধে ফেলে হাঁটে। ঠাঠা-পড়া রোদ্‌—গাছের ছায়াটি পর্য্যন্ত চুরি হয়ে গেছে। কতদূর এগোতেই পথ শেষ হয়ে যায়,—সাম্‌নে পাঁচিল, তারের বেড়া। সব কোঠাবাড়ী তৈরী হচ্ছে। যেখানে শণের ক্ষেত ছিল সেখানে একটা সুর্‌কির কল বসেছে। ঘাসের কোমল রাস্তাটি ইঁটের ভারে হাঁপিয়ে উঠেছে।

পথ বন্দী।—তবু ভোম্‌রা এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল।

ছিদামের মাথায় কাঁচের চুড়ির ঝুড়িটা তুলে দিয়ে বেঁকি ঘাড়টা বাকিয়ে একটু হাস্‌ল। ছিদাম কাঁচের চুড়ি ফিরি কর্‌তে গেল।

গাঁ সহর হয়ে উঠেছে।—যেন মাটির দুলালী মেয়েটির সারা গায়ে গিল্টির গয়না, মুখে খড়ির গুঁড়ো। আবাদিও তো ঢের হোল। রাস্তায় ছ্যাকড়া গাড়ী চলে, লোহার্‌ লোহা পেটে, দোকানীরা নানান্‌ জিনিসের সওদা করে। ছড়ি ঘুরিয়ে বাবুরা বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়।

বেঁকিকে দেখে ভোম্‌রার আড়াই হাত শরীরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল।

বেঁকি বল্লে—মাছ কিছু পেলি? মাছ না পেলে মা আজ তোর পাতে ভাত দেবেনা।

—না দিক্‌।

—কি খাবি তা হলে?

এ প্রশ্নের যে এমনধারা উত্তর হবে, বেঁকি তা স্বপ্নেও ভাবেনি।—ভোম্‌রা বেঁকির মাজাটা দুই হাতে একেবারে জাপ্‌টে ধরলে।

আড়াই-হাত বামন প্রিয়ার গ্রীবাবেষ্টন করতে পারে না, তাই কটিতটে আলিঙ্গন উপহার দেয়। প্রিয়ার মুখ আকাশের চাঁদ,—হাত তুলে ডাকতে হয়। ডাকাই সার।

ভোম্‌রা তার দুটি চোখ বেঁকির মুখের পানে তুলে ধর্‌ল—মিনতিতে ভিজা দুটি চোখ। দশ বছর আগেকার একটি দিনের কথা মনে পড়ে হয়ত, ঝাপ্‌সা, ফ্যাকাসে।

নেকড়ের মতো বেঁকি খপ্‌ করে' ভোম্‌রার ঘাড়ে ওপর এক কামড় বসিয়ে দিলে। ভোম্‌রা একটা চীৎকার করে' আলিঙ্গন ছেড়ে দিল।

বেঁকি তাড়াতাড়ি দূরে সরে' গিয়ে ডান পা-টা তুলে ওকে লাথি মার্‌বার ভঙ্গী দেখাল।

ভোম্‌রা আবার জাল কাঁধে ফেলে পথ চলে। খালি মনে হয়, চীৎকার করে' ওঠাটা ভুল হয়ে গেছে। বেঁকির ক'টি দাঁতের স্পর্শের স্বাদের দাম এ নয়। যেখানটায় কামড়েছিল সে জায়গাটায় ধীরে ধীরে আঙ্‌ল বুলায়। দাগগুলি একটু ঠাহর হয়।

আবার মনে হয়, ওর পা-তোলাটি ভারি সুন্দর।

গয়লানির মেয়ে জেলেনির ছেলের প্রেম প্রত্যাখ্যান কর্‌লে।

হোক্‌না গয়লানির মেয়ে,—তবু তো নবযৌবনা। এমন দিনে গয়লানির কালো মেয়েও রাজকুমারী বটে। সেও স্বয়ম্বরা হ'তে জানে। কাউকে আবার ঘৃণাও করে, যায় না।—জগতের সমস্ত নবযৌবনারই মতো।

বল্লে—মুখে ঝাড়ু, যেটা দিয়ে পাছদুয়ার ঝাঁটাই।

তারপর মুখে কাপড় ঠাসে, আর হাসে।

ভোম্‌রা লুকোনো ভাঁড়টা তুলে মা'র সেই সাড়ে এগারো আনা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজ্‌লে। কুসি-মাসী টের পেলনা বটে, কিন্তু এক পাশের পিয়াল গাছটা ভেঙে-চুরে পড়ে' আছে দেখে কিছু সন্দেহ করলে হয়ত।

গাছের সরু কাহিল ডালগুলি মচ্‌কে ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে ভোম্‌রা বল্‌ছিল—যা যা, সব যা। যে পুঁতেছিল তার চিতার কাঠ হ'গে যা।

দশ বছর আগে হ'তে পার্‌ত বটে। দিনের হিসেব ভোম্‌রা ভুলে গেছে। খালি মট্ মট্ করে' ডালগুলি ভাঙেই।

ভোম্‌রা জানেনা, এম্‌নি দুঃখেই কেউ কেউ বিষ খায়, কেউ কেউ মদ,—কেউ কেউ বা কবিতা লেখে।

ভোম্‌রা সাড়ে এগারো আনার কাঁচের চুড়ি কিন্‌লে। ডালায় করে' ফিরি করে, যে পথে মাছের ডুলা নিয়ে বাজারে যেত মা'র পিছু।

দশ বছর আগেকার কর্‌করে আনিটার কথা মনে হয়। বৎসরে পুরোনো হলেও ওটার দাম লাখ্ টাকার চেয়েও বেশী ছিল হয়ত। খরচ করেনি।

রাস্তার ধারে একটা লোক উল্কি কাট্‌ছিল,—অনেকেই হাত মেলে বসেছে। সাম্‌নে নমুনার একটা খাতা। ভোম্‌রা একটা মেয়েমানুষের ছবি বের করে' দেখালে। কাত্তিক একটা গোলাপফুল।

লোকটা বলেছিল—চার আনা।

ভোম্‌রা লোকটার হাতে সেই বহু-দিন থেকে পুঁজি করে' রাখা আনিটা ফেলেই এমন চোঁচা ছুটেছিল যে লোকটার সামান্যতম প্রতিবাদও ও শুন্‌তে পায়নি।

দৌড়ে একেবারে হাজির বৈঁকির কাছে। বৈঁকি তখন মশ্‌লা বাট্‌ছিল। ভোম্‌রা ওর বাঁ হাতটা মেলে ধরে বল্লে—এই দেখ্ তোর ছবি, আমার হাতের ওপর।

বৈঁকি ঠোঁট কুঁচ্‌কে বলেছিল—ও তো একটা পেত্নি, শাকচুন্নি,—পরনে একটা কাপড় পর্য্যন্ত নেই।

বৈঁকির সেই ব্যঙ্গের হাসি!—তার থেকে নোড়াটা ওর মাথায় ছুঁড়ে মার্‌লেই ভালো ছিল।

ভোম্‌রা ধরা গলায় বলেছিল—কিন্তু ঠিক তোর নাকের মতো, তোর নাক ছাবিটা পর্য্যন্ত আছে।....

আজ সেই একানিটাও থাক্‌লে কিছু তেলে-ভাজা কেনা যেত। ক্ষিদেয় দুটো পা পর্য্যন্ত ভেঙে পড়্‌তে চাইছে। তবুও এগলি ওগলি চার-পাঁচ বার করে' হাঁটে, হাঁকে বিকৃত গলায়, লোকের মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌তে।—চাই কাঁ্যাচের চুলি!—

হাত দিয়ে রগ্‌ড়ালে তো আর ছবিটা মুছ্‌বে না। তাই কখনো কখনো ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখে।

ও-ও আর সব বিরহীদের মতোই ভাবে, প্রিয়ার মূর্ত্তি ওর হৃদয়ের পাতে আঁকা!

ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটাকে মারে, খাম্‌চায়।—সেই শাকচুন্নি ছবিটাকে।

হাঁকে—চেয়াই কাঁ্যাচের চুলি—

ডালাটা ঝুড়ি হয়ে উঠেছে,—দূর্‌দরাজ গাঁয়ের মধ্যে পর্য্যন্ত ভোম্‌রার কাঁচের চুড়ি মেয়েদের হাতে। কচু-পাতা, রামধনু, সোনাল্ লতা চুড়ি। বলে—এটা তোমাকে মানাবে না, তুমি পর এই পাকা আউষ ধানের চুড়ি, আর ছোটখুকী, তুমি এই কাঁচা-ডালিমটা।

মেয়েটি বলে—তোমার হাতে ন্যাকড়া জড়ানো কেন? ঘা?

ঘাড় নামিয়ে ভোম্‌রা বলে—হ্যাঁ—

কলঙ্কের ঘা, যৌবনের সব চেয়ে প্রথম ভুলের দাগ। বোঝে কিন্তু বল্‌তে পারে না। আর কাকেই বা বল্‌বে?

দর্জ্জিরা কল চালায়, ঘণ্টা বাজিয়ে ছোক্‌রা-বাবুরা পা-গাড়ী চড়ে, ভিস্তিওলা রাস্তায় জল ছিটোয়। মাছের বাজার শান্-বাঁধান হয়ে গেছে। নামহীন অলি গলির

মোড়ে মোড়ে বাতির থাম,—কাঠের। শুক্লপক্ষে জালানো হয়না। তাই জ্যোৎস্না রাতগুলিই খালি চেনা লাগে,—তাও ভারি বিমর্ষ।

ফের রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে। নল্ বসবে।

নবনে গাঁইতিটা ফেলে রেখে শুঁড়ে করে' কি কতগুলো ঢক্ ঢক্ করে' গেলে। বলে—হ্যাঁ বাবা, সব্ব শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে, চন্‌চনে। এখন খাট', খেটে সুখ। জুম্। বলে' হাঁটুর ওপরের কানীটা আরো একটু তোলে।

গরুর গাড়ীর সঙ্গে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ীর টক্কর লাগে। সেদিন তো বুড়ী চাঁড়ালনী একেবারে চাকার তলায়ই পড়ে' গেছল। গাড়োয়ান খাপ্পা হয়ে বল্লে—মাগী রাস্তার মাঝখানে বড়ি শুকোচ্ছে—

বুড়ি খেঁৎলান পা-টা চেপে ধরে' বল্‌ছিল—চিরকেল এখানেই বড়ি শুকোলাম, তুই—

বুড়ি গালমন্দ করে। সবাই বুড়িকেই মারতে আসে। বুড়িরই দোষ।

বড়লোকের মেয়ের কাঁচের চুড়ি পর্‌বার সাধ গেছে। ফিরিওলাকে ডাকে,—হেসেই কুটপাট।

মেয়েটি কেন হাসে, সে বিষয়ে ভোম্‌রা মনে মনে কোন প্রশ্নই করে না। ভাবে, মেয়েটির হাসি ভারি সুন্দর। যেন অঞ্জলিতে করে' ভরে' নেওয়া যায়, তরল স্বচ্ছ জলের মতো।

মেয়েটি বল্লে—এই লাল চুড়ি জোড়ার দাম কত?

ভোম্‌রা বল্লে—দশ পয়সা।

পেছন থেকে কে বলে' উঠ্‌ল—আমি ঠিক ঐ চুড়ি ছ' পয়সাতে দেব। দেখ্‌বে?

ভোম্‌রা অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখে—ছিদাম।

ছিদাম সত্যি সত্যিই ছ' পয়সাতে ছাড়লে। মেয়েটির দু'টি হাতে পরিয়েও দিলে।

রাস্তায় এলে ভোম্‌রা বল্লে—শুধু শুধু চারটে পয়সা গচ্চা দিলি যে?

মুচ্‌কে হেসে ছিদাম বল্লে—নইলে ঐ দুখানি নরম হাত,—যেন দুধে ধোয়া। কত চার পয়সাই ত'—হেঁ!

ভোম্‌রা নিজেকে বোকা অজ্‌বুগ বলে বকে। ইচ্ছে করে মেয়েটিকে অম্‌নিই চুড়ি জোড়া দিয়ে আসে, মাগ্‌না। একদিন সমস্ত ঝুড়িটাই মেয়েটির বাড়ীর বারান্দায় রেখে এল।

বেঁকির সাথে ছিদামের বিয়ে হবে।

সমস্ত সংসারে একটি লোককেই ও চায়,—বেঁকি ভাবে। ভোম্‌রা ভাবে—সমস্ত সংসারে একটি লোককেই ও চায়না।

তবুও, যেমন করে বিয়ের রাতে জগতের সমস্ত তরুণ-তরুণীর বুক দোলে, তেম্‌নি ওদেরো বুক দুল্‌ছিল। এক তিল কম নয়। তেম্‌নিই স্বপ্ন দেখেছিল ওরা—

নবনে বল্লে—আরো চিড়ে এনে দেব নাকি রে ভোম্‌রা! খা না, যত পারিস্।

ভোম্‌রা গ্যাঁট্ হয়ে বসে' বোকার মতো বলে—আন্ না। খাবই ত।

দাঁতগুলি বের করে' রাক্ষসের মত গেলে, চিবোয় পর্য্যন্ত না। শুক্‌নো চিড়েগুলো ভেতরের দিকে অনবরত ঠেলে ঠেলে যেন উদ্গত বেদনার মুখ খেঁৎলে দেয়। দু'পাটি দাঁত খুলে বলে—আন্। আরো খাব।

পরে ওরা যখন শুতে গেল, ও নির্জ্জন রাতে আস্তে আস্তে ল্যাম্প পোষ্টটা বেয়ে বেয়ে উঠে লণ্ঠনটা নামিয়ে আন্‌লে। কতগুলি শুক্‌নো খড়কুটো জ্বালাল। তারপর নিজের বাঁ হাতটা সেই আগুনের মধ্যে মেলে ধর্‌ল।

সেই ছবিটা পুড়ুক,—সেই শাকচুন্নি ছবিটা। সেখানে সত্যিসত্যিই একটা ঘা হোক্।

আরো বছর যায়,—লম্বা লম্বা বছর।—

তবু সেই আড়াই হাতই—

রাস্তায় লোক গিস্‌গিস্ করে, নোংরা বস্তিতে মারী লাগে,—ছারখার হয়ে যায়; আবার বস্তি বসে। ভিস্তি-ওয়ালার বদলে জল-ফেলা গাড়ী হয়েছে, তাও গ্রীষ্ম-কালে। বর্ষাকালের শুক্লপক্ষের রাতগুলিতে কেরোসিনের বাতি জ্বলে আজকাল। একটি ছোট পোষ্টাপিস্, সাহেবদের একটা বাংলো, এক বিদেশী ব্যবসাদারের একটা চা'লের কার্‌খানা,—সারাদিন কলের হুস্‌হুস্।

কাক ডাক্‌বার আগেই কলের কাংরানিতে সারা সহরের ঘুম ভাঙে।

রাস্তার মোড়ে ভোম্‌রা দোকান ফেঁদে বসেছে,—মনিহারী। সবাই বলে 'গুরগণের দুকান'। সবাই বলে, রাস্তায় শফর করতে করতে হঠাৎ ও ফিরির ঝুড়িটা নিয়ে থেমে পড়ল। ঝুড়ি ত নয় লোহার সিন্দুক,—তাই মাথায় করে' আর বওয়া যায়না।

সেই মাটির তলে পোঁতা সাড়ে এগারো আনা পয়সা পর্য্যন্ত সাড়ে এগারোশ' টাকায় বাড়্‌ল—

মাইনে দিয়ে দুটো ছোক্‌রা চাকর পর্য্যন্ত রেখেছে, মাল এগিয়ে দিতে। বেঁটে মোটা ছেলেটাকে যখন খুসী মারে, ঢ্যাঙা ছিপ্‌ছিপে ছোঁড়াটাকে কারণে অকারণে পয়সা দেয়, আদর করে। আর নিজের এই অন্যায় তরফ্‌দারিতে হাসে, মনে মনে বলে—একশো বার মার্‌ব, আমার ইচ্ছে।

কীই বা না বিক্রি হয়? ফিডিং বোতল থেকে সুরু করে' শিশি করে' আমের চাট্‌নি পর্য্যন্ত। পাথরের থালায় করে' কেউ আর আমসত্ব দেয় না, দোকান থেকে কেনে। সাবান, বিস্কুটের টিন, চায়ের কৌটো, কন্‌-ডেন্স ড্ মিল্ক, ভিনিগার্,—সে দিন ছিদাম একটা দামী পমেটম্ পর্য্যন্ত কিনে নিয়ে গেল,—বৈকিরই জন্য নিশ্চয়।

ভোম্‌রা বল্লে—পয়সা-টয়সা কামাতে পাচ্ছিস্ না নাকি আজকাল? আমার দোকানে থাক্ না। রঙ্গাকে না হয় উঠিয়ে দেব।

সেই ঢ্যাঙা ছোঁড়াটা, রঙ্গা চম্‌কে ওঠে। ছাড়িয়ে দিতে হলে তাকেই ছাড়িয়ে দেবে—এর তাৎপর্য্য ও বুঝে উঠ্‌তে পারে না। কালও তো মুনিব ওকে হিসেবের ফাল্‌তু পাঁচ আনা পয়সা লুকিয়ে দিয়ে দিল।

ছিদাম অপমান বোধ করে,হয়ত, রাজী হয় না। ধার কর্জ্জ ক'রেই বৈকির বিলাস জোগায়। বৈকি বলে—একটা আল্‌তার শিশি আন্‌তে পারিস্ না কিনে, না গালে মাখ্‌বার একটা রং-এর বাক্স। বিয়ে করেছিলি কেন তবে মুখপোড়া?

রোজ্‌ মেলেনা সব দিন। তাই যার তার কাছে হাত পাত্‌তে হয়। ছিদাম সাহেবদের বাংলোতে পাখা টানে। অবশ হাতে পাখা টান্‌তে টান্‌তে এক মিনিটের জন্যও ঝিমোলে পিঠে খেতে হয় সেদিন, পেটে নয়।

বেহারি সওদাগরের কার্‌খানায় কাত্তিক মিস্ত্রির কাজ করে,—ট্যাঁকটা ওর ভরা। পায়ে ফুল-মোজা এঁটে চটি পরে' ফট্‌ফট্ করে' বেড়ায়, ক্ষুর দিয়ে মাথার পেছনটা প্রায় চাঁছা, মাজায় রুমালের ফেট্ বাঁধা একটা। একটা ডুগি-তব্‌লা নিয়ে সারা রাত তাল ঠোকে আর যা-তা গান গায়। তাই শুনে বৈকি খিল্ খিল্ করে হাসে, আর লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে, বলে—কাত্তিকটা কী ছেনাল্! রসবড়া আমার!

কাত্তিক বলে—এই বেশ, গান গা', আর তুড়ি দে'। তারপর এই লাইনটাই খালি নানা সুরে তব্‌লায় চাটি মেরে মেরে গাইতে থাকে—

বিজ্‌নু ধোপার ডব্‌কা মেয়েটার দিকে প্যাট্‌প্যাট্ করে' তাকায়। বলে—বিয়ে কর্‌বি আমাকে?

মেয়েটা হেসে বলে—আমি কি তব্‌লা নাকি রে, ছেনাল্?

নব্‌নে দোকানের বেঞ্চিটার ওপর এসে বস্‌লে। ওর চোখে একটা চশ্‌মা, নিকেল্-এর,—একটা ধার ভেঙে যাওয়াতে লাল সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা।

চশ্‌মা পরেছে,—এ যেন ওর প্রকাণ্ড একটা গর্ব্ব,—এম্‌নি করে' ঘোলাটে কাঁচদুটোর ভেতর থেকে চায়।

চশ্‌মাটা কপালে তুলে ময়লা কাপড়ের খুটে চোখ দুটো রগ্‌ড়ে ফের চশ্‌মাটা নামিয়ে বল্‌লে—কি কলই

বানিয়েছে বাবা, যেই চোখে লাগানো, অম্‌নি সব দিক ঝিল্‌মিল্ করে' ওঠে।

রঙ্গা জিগ্‌গেস করলে—কিসে চোখদুটো গেল ?

—কিসে আবার ? অম্‌নিই। একদিন কতগুলি সুর্‌কি গেছ্‌ল বটে ঢুকে'। তাতে কি ?

চশমাটা ওর মস্ত বাবুগিরি। বারে বারেই খালি কাঁচ দুটো মোছে, লাল সুতোটা নানা ভাবে কানের সঙ্গে জড়ায়।

ওর গলাটা ভারি সরু দেখাচ্ছে,—জামাটা খুল্‌লে পাঁজরও গোণা যায় হয়ত। বুনো মোষ নয়, খেতে-না-পাওয়া পিট্টি-খাওয়া কাঙাল বেতো ঘোড়া।

বল্লে—জানিস্ ভোম্‌রা, এবারে এখানে রেল্ বস্‌বে। আবার গাঁইতি নিয়ে বেরুব।

এক গাহেককে একটা লণ্ঠন ফিট্ ক'রে দিতে দিতে ভোম্‌রা বল্লে—তোর এই ভাঙা দেহে কুলুবে ?

চশ্‌মাটা নাকের ওপর ঠিক ক'রে বসিয়ে নব্‌নে বল্লে—কি যে বলিস্ ? গাঁইতিটা হাতে নিলেই আমার ডানা দুটো ফের ফুলে' উঠ্‌বে। কাশিটাও আর থাকবে না। এতদিন রাস্তা-টাস্তা খুঁড়্‌তে পাইনি বলে'ই ত' এমন ছিরি হয়েছে চেহারাটার।

পরে বল্লে—রেল্-রাস্তা কর্‌বার মজুরি নিশ্চয়ই বেশি হবে। ট্যাঁক্ আবার ভ'রে উঠ্‌লেই একটা ভালো দেখে চশ্‌মা কিন্‌ব।

বলে, আর অন্যমনস্কের মতো শূন্য ট্যাঁকটার ওপর হাত বুলায়।

একসময় বল্লে হঠাৎ—জানিস্ কাল রাতে বৈকিতে আর ছিদামেতে ভীষণ মারপিট্ হয়ে গেছে। বৈকি মেরেছে ছুঁড়ে পিতলের থালটা ছিদামের মাথায়, খুনখুন হয়েছিল আর কি! মেয়ে তো নয় রাক্ষসী।

প্রায় তক্ষুনিই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছিদাম এসে হাজির, মাথায় রক্তে-ভিজা ন্যাক্‌ড়ার একটা ফেটি বাঁধা।

হাত পেতে বল্লে—আমাকে একটা আল্‌তার শিশি দিবি ভোম্‌রা ?

ভোম্‌রা কোনো কিছুই লক্ষ্য না করে' বল্লে—দাম সাড়ে ন' আনা।

—বাকী দে এবারটি ভোম্‌রা—

ভোম্‌রা একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়্‌ল যেন,—যা যা বেরো আমার দোকানের সমুখ থেকে। বাকী নিতে এসেছেন ? আল্‌তার শিশি বেটপ্‌কা আকাশ থেকে পড়েছে যেন!

ছিদাম ম্লান মুখে বেরিয়ে যায়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

হঠাৎ ভোম্‌রা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—শোন্ শোন্ ছিদাম, নিয়ে যা আল্‌তার শিশি।

আল্‌তার শিশিটা ছিদামের হাতে দিয়ে পরে খুব আস্তে বল্লে—বৈকি নিজে এলেই তো পার্‌ত চাইতে!

ছিদাম মিনতি ক'রে বল্লে—আর চারটে চুলের কাঁটা দিবি, রেশ্‌মী ফিতেও,—এই একহাত হলেই হবে। রেল্-রাস্তার মজুরি করে' সব তোর শুধে দেব ভোম্‌রা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্। এই নে। আর এই একটা নতুন ঠোঁটে মাখ্‌বার রং বেরিয়েছে এটাও নিয়ে যা।

ছিদাম কাঁচুমাচু হয়ে বল্লে—দাম কত এর ?

—যা যা, দাম জিগ্‌গেস কর্‌তে হবে না। আর এই নে, নতুন ঢঙের শাঁখা বেরিয়েছে, ওর খুব পছন্দ হবে।

দিতে দিতে শেষ পর্য্যন্ত কীই বা না দিল ? এসেন্সের শিশি, দার্জ্জিলিঙের পাথরের মালা পর্য্যন্ত।

বলে—আর কি নিবি বল্ ?

ছিদামের কোঁচড় ভরে' উঠ্‌ল।

নব্‌নে বল্লে—দোকান উঠিয়ে দিচ্ছিস্ নাকি রে ?

—উঠ্‌লেই হোল আর কি ? মাগ্‌না উঠ্‌বে ? এই লোহার কড়াটাও নিয়ে যা, বৈকি তোকে মাছ ভেজে খাওয়াবে। আর এই বাল্‌তিটা।

ভোম্‌রা যেন পাগল হয়ে গেছে। একদিনেই দেউলে হয়ে যাবে।

ছিদাম চলে' গেলে নব্‌নে ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্লে—বৈকির সঙ্গে ওর ভালো বনিবনাও হচ্ছে না। দিনে-

রাত্রে সাপে-নেউলে লেগেই আছে। জানিস্, বেঁকির জিভ্ কাত্তিক-মিস্ত্রির ওপর—

ভোম্‌রা কিছুই বলেনা, এলোমেলো দোকানপাটের দিকে চেয়ে থাকে। একটা তাক্ প্রায় খালি হয়ে গেছে।

অনেকেই ভুল করে,—বেঁকিও করেছিল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার বরল, ছিদামকে ও চায়না,—ছিদাম ফুরিয়ে গেছে।

কাকে চায় বুঝে উঠ্‌তে পারেনা। ভাবে, কাত্তিককেই বুঝি!

কাত্তিক তব্‌লায় চাঁটি মেরে মেরে টপ্‌পা গায়, আর বেঁকি জামার তলা থেকে রুমাল বের ক'রে নেড়ে নেড়ে হাসে। বলে—কেয়াবাৎ কালোয়াৎ।

ছিদাম বাইরের থেকে ডাকে—ঘরে আয় বেঁকি।

বেঁকি চেঁচিয়ে বলে—যাবনা। এই আমার ঘর।

কাত্তিক বলে—এবারে গান বন্ধ। যা। খুনখারাপি হবে একটা। এক রকম জোর ক'রেই ঘর থেকে তাড়ায়। পরে ফের তব্‌লায় চাঁটির পর চাঁটি চল্‌তে থাকে—অনেক রাত।

পাশের ঘর থেকে বিজ্‌হুর মেয়ে বলে—ঘুমুবিনা? সারা রাতই—

কাত্তিক জবাব দেয়—সারা রাতই। তোকেও ঘুমুতে দেব না।

নতুন রেল্ বস্‌ছে। নব্‌নে থক্ থক্ করে' কাশে, তবু গাঁইতি চালায়। হঠাৎ সুতোর বাঁধা ছিড়ে দশমাটা ইটের গাদার ওপর চুরমার হয়ে গেল।

নব্‌নে ফিরে এল। গাঁইতিটাও আর নিয়ে এলনা।

বল্লে—চোখে দেখ্‌তে না পেলে শেষে গাঁইতিটা পায়ের ওপরই চালিয়ে দিই আর কি!

সমস্ত পাঁজরগুলি মোচড় দিয়ে কাশ্ ওঠে,—রক্ত। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে' রাস্তার ওপর ব'সে পড়ে।

ভোম্‌রা তাল-পাতার একটা পাখা দিয়ে হাওয়া করে, চোখে মুখে জল ছিটোয়।

রেল্ বসে' গেল,—টিনের ঘরে চাটায়ে বেড়ার একটা ইষ্টিশান ঘর পর্য্যন্ত।

যাত্রীরা গাড়ী থেকে নেমে পান কিনে খেতে খেতে এঞ্জিন ড্রাইভারকে নাম ধরে' ডেকে বলে—পান্-টান খেয়ে নি বাবা, তারপর চালাস্।

কেউ কেউ বলে—সেই সন্ধ্যে থেকে বন্ধ গাড়ীতে বসে' আছি। একটু হেঁটে নি বাবা মাঠের ধারে। তারপর গাড়ী ছাড়িস্ রে হেবো।

তারপরই গাড়ী ছাড়ে।—

মর্জ্জি মতো নাবে, আবার দৌড়ে গিয়ে ধরে। গাড়ী তো নয়, একটা লোহার বিছে,—বেঢপ্, বিচ্ছিরি।

নতুন নতুন লোকের আম্‌দানী হয়,—কাব্‌লীওলা যাত্রাপার্টি, বহুরূপী। একবার গাড়ী ভরে নানা বয়সী কতগুলি মেয়েমানুষ এল,—এক দঙ্গল। মজুমদার পাড়ার মাঠের নতুন বস্তিটাতে এসে উঠল। সাপের বাচ্চার মতোই কিল্‌বিল্ করছে।

ভোম্‌রার দোকানে মালপত্র আজকাল একেবারে ভেলুরহাট্ ইষ্টিশানেই আসে। সাতক্রোশ দূরে বড় ইষ্টিশান থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে আর আন্‌তে হয় না। রঙ্গা বলে—ভালোই হয়েছে।

বুড়ীরা আগে আগে রেল্ দেখে পেন্নাম করত, বল্‌ত—জগন্নাথের রথ।

ইদানীং বলে—কী সারা দিন রাত ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, সোয়াস্তি নেই। দে না আগুন লাগিয়ে কেউ।

সেদিনের সন্ধ্যের গাড়ীটা ভেলুরহাট্ ছাড়িয়ে কদ্দূর এগোতেই হঠাৎ থেমে পড়ল।

যাত্রীরা সব নেমে জিগগেস করে—কি হ'ল রে হেবো?

হেবো বল্লে—কি একটা আচম্‌কা হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল চাকার তলায়।

গাড়ীটা 'ব্যাক্' করে। উৎসুক জনতা চেয়ে দেখে, একটা মানুষ কাটা পড়েছে। কেউ কেউ চিন্‌তে পারে হয়ত—আরে এ ছিদাম যে—

তারপর থানা থেকে পুলিশ এল লাঠি নিয়ে। ঠেঙিয়ে ভিড় তাড়াল,—ট্রেণটা 'পাস্' করিয়ে দিলে।

বেঁকি অবশ্যি শোকের কার্পণ্য করলে না। কাঁচের চুড়িগুলি ভেঙে থান্ কাপড়ও পর্‌লে।

তবুও উদাসীর মতো মাঝরাতে কাত্তিকের ঘরের পাশে ঘুরে বেড়ায়। পাশাপাশি ঘরে কাত্তিকের আর বিজনুর মেয়েটার কথাবার্ত্তা চুপ ক'রে শোনে।

বিজনুর মেয়ে বলে—যাই বলিস্, বেঁকির বড্ড লেগেছে। ওর কান্না শুনে বুক ফেটে যায়।

কাত্তিক বলে—যাট্। আমারই তব্‌লা ফাটুক।

হঠাৎ বেঁকি চেয়ে দেখে,—সাম্‌নে ভোম্‌রা। চম্‌কে রুখে বলে—তুই ওখানে কেন রে ঠুঁটো?

ভোম্‌রাও বলে—তুই এখানে কেন?

যেখানে বেঁকি পায়চারি করে তার খানিকটা দূরে ভোম্‌রা হেঁটে বেড়ায়—

জলে পা ডুবিয়ে বেঁকি বসে',—চুপচাপ,—যেন কান্না ফুরিয়ে-ফেলা শফেদ্ একটা মেঘ।

আবার ঠুঁটোটা পেছনে। বেঁকির সমস্ত গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

জলের থেকে পা না তুলেই বল্‌লে—লুচি খেতে গেলি না? সেবার তো খালি চিঁড়ে গিলেছিলি।

ভোম্‌রা কিছুই বল্‌তে পারেনা, খালি অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকে। অনেকবাদে বোকার মতো খালি বল্‌তে পার্‌ল—আমার দোকানে চল্।

—কেন? বেঁকি ভুরু কুঁচ্‌কে ঝাঁঝালো গলায় আঁৎকে উঠল যেন।

চোখের জলের মতো ঘোলা চাঁদের আলো ভোম্‌রার হৃদয় পর্য্যন্ত যেন এসে পৌঁছুল। বল্‌লে—সেই দোকানই তো আমার ঘর, আমার সগ্‌গ—

ব্যাকুলতা জানাবার ভাষা খুঁজে পায়না হয়ত, হাত দুখানি ধরতেও অনির্ব্বচনীয় কুণ্ঠা লাগে।

বেঁকি ফট্ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিজনুর মেয়ে আর কাত্তিক মিস্ত্রি এক সঙ্গে সমস্ত জীবন থাকবে,—তাই আবার বোয়ালপুকুরের বস্তিতে ঢাক ঢোল্ বেজে উঠেছে। মশাল জলেছে,—ঘেয়ো কুকুরেরা লড়াই লাগিয়েছে পর্য্যন্ত।

সমস্ত ভেলুরহাট সর্‌গরম। সবাই বলে—কাত্তিক মিস্ত্রি খরচ কর্‌ছে বটে, পয়সা তো নয় খোলামকুচি।

মাথায় পাগড়ী বেঁধেছে, গায়ে জোব্বা,—কাঁধ দিয়ে একটা তলোয়ার পর্য্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে।

নবনে বল্লে—খেয়ে নি পেট্ পুরে, আর কতদিনই বা বাঁচব? কাশে, আর কাশ থাম্‌লে লুচিগুলি মুখে গোঁজে আর গেলে।

বৃষ্টির জলে বেহায়া নালাগুলো থই থই করে' উঠছে—দু একটা শাপলা এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে যেন। নালার

ভোম্‌রা হাঁটু গেড়ে বসে' পড়ল হঠাৎ। তা দেখে বেঁকির মুখে কাপড় ঠেসে কী হাসি! তখন ভোম্‌রাকে বোধহয় ঘাসের ডগার চেয়েও বড় দেখায়নি।

—তোর পায়ে আমি সমস্ত দোকান উজাড় করে' ঢেলে দেব বেঁকি, তুই আয়। নতুন নতুন ক্রিম্ এসেছে গালে মাখ্‌বার, নতুন নতুন গয়না—, তোকে টাকা বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুম পাড়াব।

নদীর ঢেউর মতো বেঁকি ভেসে উধাও হয়ে চলে' যায়। তবুও তেম্‌নি উবু হয়ে ভোম্‌রা বলে' চলে—সে অনেক টাকা, তুই তা ভাবতেও পারিস্ না। কি কর্‌ব আমি এ সব দিয়ে? সব তোর,—তোর—

তারপর দূর থেকে একটা ঢিল ধুপ করে' প্রায় ভোম্‌রার মাথায় এসে পড়ে।

ভোম্‌রা দোকানে চলে' গেল। সারারাত জেগে দোকানটা ভালো করে' নতুন রকম গুছোল, ঝাঁটা নিয়ে ধূলো ঝাড়লে তারপর হিসাব মিলাতে বসল, বলতে লাগল—দেব ছোঁড়াছুটোকে উঠিয়ে, অকম্মার ঢেঁকি—নিজেই পারব একা,—আমারই তো সব—

তারপর নগ্‌দা টাকার থলিটায় হাত ঢুকিয়ে রেস্তগুলি নেড়ে চেড়ে বাজনাই বাজায় হয়ত।

আরো বছর ধোরে—

সম্প্রতি এদিকে এক নতুন রকম ব্যায়রাম দেখা দিয়েছে,—গায়ে সব ফুস্কুরি ওঠে।

নব্‌নে এসে তার নাপতের বাক্সটা ভোম্‌রার দোকানেই জিম্মা রাখলে। বল্লে—আমি এবার সত্যিসত্যিই চল্লাম ভোম্‌রা। যদি কোনো বেকার লোক দেখিস্, তা'লে এ বাক্সটা দিয়ে দিস্ তাকে—

নব্‌নে শেষপর্য্যন্ত মরল কাশিতে নয়,—এই নতুন ব্যায়রামে।

সবাই এ-ওর মুখ চাওয়াচায়ি করে।

ভোম্‌রার দোকান আরো যেঁপেছে। বছরও বেড়েছে বটে কিন্তু বয়স বাড়েনি যেন।

সেই বেঁটে চ্যাপ্‌টা মুখ ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রঙ্গারও ব্যামো হওয়াতে ছুটি নিয়েছে—চিরকালের ছুটি। ভোম্‌রা এখন একেবারে একা। জিনিসপত্র নাড়ে চাড়ে আর খালি যেন হাঁপায়, বলে—কী হবে এ সবে? ছাই—

ঘর ছেড়ে বেরোয়। রাত ক'রেই,—ঠাণ্ডায়। পাঁচহাতি কাপড়ের খুট্টা গায়ে জড়িয়ে নেয়। কেউ বলে—এই শীতে তোর গায়ে কি একটা কম্বলও উঠ্‌বে না? কিপ্‌টে কোথাকার!

ভোম্‌রা হেসে বলে শুধু—তোর যদি দরকার হয় আসিস্ দোকানে,—অম্‌নি দেব; মাগ্‌না। যার যা দরকার—

আস্‌তে আস্‌তে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েগুলির নোংরা বস্তির কাছেই এল,—যেন পথ ভুলে।

তখনো কতগুলি মেয়ে শীতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—বেঁকির গায়েও একটা কম্বল নেই।

ওকে দেখে সবগুলি মেয়ে কিল্‌বিল্ ক'রে হাসে, এ ওর গায়ে চ'লে পড়ে,—নানান্ কথা কয়ে ক্ষেপায়। বেঁকিও হাসে,—তেম্‌নি, মুখের মধ্যে কাপড় ঠেসে।

যেন অনেকদিন ওরা মন প্রাণ খুলে হাস্‌তে পায়নি—

ভোম্‌রা কোন কিছু ভ্রূক্ষেপ না ক'রে অস্থিরের মতো এ মোড় থেকে ও মোড় ঘুরে বেড়ায়,—একটিও কথা মুখে আসে না। সব যেন বুকে আথালি পাথালি করে।

বেঁকি একেবারে একটা ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে এল এবার—বেরো বেরো ছুঁচো কোথাকার,—আবার তক্ষুনিই মুখে কাপড় ঠেসে হাসে।

প্রিয়ার দ্বার আজো ওর জন্য রুদ্ধ—

চলে' যেতে যেতে দুখানা নোট্ বেঁকির দরজার গোড়ায় ফেলে দিল—বেটপ্‌কা।—ও যেন একটা কম্বল কিনে গায়ে দেয়। নইলে যে অসুখ করবে ওর—

তারপর দোকানেই ফিরে আসে।

সমস্ত জান্‌লা কবাটগুলো এঁটে বন্ধ করলে। কেরোসিনের ভরতি টিন্‌গুলো একসঙ্গে জড় করলে। তারপর ভালো ক'রে সমস্ত সাজানো জিনিসগুলির দিকে চেয়ে দেখ্‌লে একবার।

নবনের সেই নাপ্‌তের বাক্সটা পর্য্যন্ত। একটা দীর্ঘশ্বাস শুধু—

তারপর কি?

তারপর শুধু দেশ্‌লাইর একটা কাঠি—

# ব্যথার তৃপ্তি

শ্রীনৃসিংহদাসী দেবী

কমলাখালি একটী ছোট পল্লী। শহরের মত বিরাট জনতার ভিড় কখনো সেখানে হয় না,—কর্পোরেশন অথবা মিউনিসিপ্যালিটীর কোন হ্যাঙ্গামা সে দেশকে কোন দিন উদ্ব্যস্ত করে নাই। সে দেশের গৃহস্থেরা দিনে পরিশ্রম করে, সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালে, মন্দ-ধূপের গন্ধে গৃহাঙ্গন সুরভিত করিয়া থাকে, তারপর শ্রান্ত দেহগুলিকে বিছানায় বিছাইয়া নিদ্রা যায়। সেখানকার বাসিন্দারা চাঁদের আলোকে যেমন পূর্ণভাবে উপভোগ করে, অন্ধকারের আধিপত্যকেও ঠিক তেমনি ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া লয়, কোন ত্রুটি করে না।

এই দেশেরই সবুজ বনানীর শান্ত হাওয়া মাখা অনেকগুলি কুটীরের ভিতর যে কয়খানি ইট কোঠা দেখা যাইত, তাহার ভিতর স্বর্গগত হরিধন রায়ের বাড়ীটা ছিল অন্যতম। দেশের অপর পাঁচজনের নিকট এই পরিবারের সম্মানও বড় মন্দ ছিল না। জমিদারী এই বংশের ছিল না বটে কিন্তু কোম্পানীর কাগজের যে আয়টা ছিল, তাহার দরুণ সংসার প্রতিপালনের জন্য কোন দিন অভাব-গ্রস্ত হইতে হয় নাই। তবে তিন পুরুষ আগে যিনি এই আয়টা করিয়াছিলেন তিনি যে এই মূল টাকাটা কেমন করিয়া সংগ্রহ করেন তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং সন্ধান করিতে গেলে প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সব অতীতের কথা।

বর্ত্তমানে সংসারটীর যে অবস্থা, তাহাতে সংসারে গৃহিনীর ভিতর হরিধনের বৃদ্ধা মাতা, তাঁহার দুইটী পুত্র, একটী পুরাতন ভৃত্য, একটী পরিচারিকা লইয়াই এ সংসারের পরিবার গণনা চলিত, অন্নবস্ত্রেরও কোন অসচ্ছলতা দেখা যাইত না। বড় ক্ষিতীশচন্দ্র অধিকাংশ সময় শহরেই কাটাইত, কারণ সে তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, ছোট সতীশ বছর খানেক আগে আই-এ- ফেল করিয়া বাড়ীর তদারক ও কৃষিকর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া নিজের ভাগ্যপরীক্ষা আরম্ভ করে।

এই সময়ে একদিন ক্ষিতীশের বিবাহ সম্বন্ধ আসিল। তখন আশ্বিন মাস, ক্ষিতীশ বাড়ীতেই উপস্থিত, সুতরাং বিশেষ ভাবে তাহার কাছে আহ্বান লিপি না গেলেও

নির্জ্জন সন্ধ্যায় অবসর বুঝিয়া ধীরে ধীরে ঠাকু-মা তাহার কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিলেন, এবং নিজের যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মত আছে তাহাও জানাইলেন,—আরো এটুকু বলিতেও ভুলিলেন না যে, মেয়েটী সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মত।

ক্ষিতীশ একটু হাসিয়া সকৌতুকে উত্তর দিল—আমার পছন্দ বলে তো কিছু নেই ঠাকু-মা, বলি তোমার পছন্দ হয়েছে তো, তাহলেই হবে।

তা কি হয়! তুই একবার নিজে চোখে দেখে আয়—বলিয়া বৃদ্ধা ক্ষিতীশের মুখের দিকে চাহিতেই ক্ষিতীশ পূর্ব্বের মত ভাবেই বলিল—

তার জন্যে আমি মোটেই ব্যস্ত নই ঠাকু-মা, আমি হয়ত বিদেশেই বেশী দিন থাকব, ঘরকন্না যা-কিছু তোমাকেই বেশী করতে হবে, কাজেই পছন্দটা বেশী করে নিতে হবে এটা ঠিক, আর আমি জানি ঠাকু-মা'র পছন্দ হলে আমার কোন লোকসানও হবে না। এ বিশ্বাসটা তোমার উপর আমার আছে।

কথার শেষে ক্ষিতীশ থামিলে উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে ক্ষিতীশের মাথার উপর হাত রাখিয়া ঠাকু-মা বলিলেন—সত্যি ক্ষিতু! কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার চোখের প্রান্তে দুইটী বিন্দু মুক্তার মত টল টল করিয়া উঠিল, সমস্ত বুকটা তাঁহার তখন ভরিয়া উঠিয়াছে অতীতের বেদনা ও ভবিষ্যতের আনন্দ-কল্পনার অধীরতায়।

ইহার অল্প দিন পরেই নব বসন্তের আগমনগীতির সঙ্গে, গন্ধভরা কুঞ্জকাননের অনেকখানি গন্ধমাখা অঙ্গে নব বধূবেশে সুরুচি আসিয়া ক্ষিতীশদের অঙ্গনে দাঁড়াইল। ঠাকু-মা তার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া নব-দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে তুলিলেন। অনেকখানি আনন্দের সঙ্গে সতীশ আসিয়া সুরুচির পায়ের ধূলি মাথায় লইল। কোনদিক হইতে কয়দিন ধরিয়া উৎসবের কোন ত্রুটি রহিল না।

অথচ ক্ষিতীশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহার যেন বারম্বার মনে হইতে লাগিল কোথায় যেন একটু ভুল রহিয়াছে। সুরুচির বাপের প্রশংসা তাহাকে মুগ্ধ করিলেও কয়দিনের ব্যবহারের ভিতর তার তরুণ মনের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ চিত্রটী সে খুঁজিয়া পাইল না। সে বুঝিল না এইটুকু কি, আবার বুঝিলও অনেকখানি।

( ২ )

চৈত্রের উদাসী সন্ধ্যার কর্ম্মবিহীন অবসরে সুরুচি জানালার পাশে বসিয়াছিল,—আকাশের সন্তরণশীল এক ঝাঁক পায়রা আপন আশ্রয় মুখে চলিয়াছে, দিনান্তের সূর্য্যের শেষ গৈরিক আভা তাহাদের পাখাগুলিকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, সুরুচির দৃষ্টিটা ছিল সেই দিকে।

এই সময়ে ক্ষিতীশ ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর দাঁড়াইল, তাহার পদশব্দে সুরুচি মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই ক্ষিতীশ প্রশ্ন করিল—আজ কেমন আছ সুরুচি?

দুই বৎসর পরের কথা। এই দুই বৎসরে সংসারটার বেশ একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। ঠাকু-মা মাটীর পৃথিবীর দেনা-পাওনা শোধ করিয়া বৎসরাবধি স্বর্গের বাসিন্দা হইয়াছেন, এবং ক্ষিতীশের সংসারে একটী অপরিচিত আগন্তুক আসিয়া একান্ত নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছে, এই আগন্তুকটী ক্ষিতীশের এক মাত্র পুত্র খোকামণি।

এই খোকামণির শুভাগমনের পরেই সুরুচির পূর্ব্বস্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, যখন ছয় মাসেও তাহার সারিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন সকলেই বেশ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুরুচিও বেশ বুঝিতেছিল, এই যে সমস্ত সংযোগ, এ আর তার বেশী দিন নয়। সুতরাং ক্ষিতীশের প্রশ্নের উত্তরে সে উদাস কণ্ঠেই বলিল—রোজ যেমন থাকি।

আজও জ্বর হয়েছে! চিন্তিত ভাবে সুরুচির ললাট স্পর্শ করিয়া ক্ষিতীশ গম্ভীর হইয়া গেল।

অত্যন্ত ধীর ভাবে সুরুচি উত্তর দিল—ভেবে কিছু হবে না, এতদিন ত অনেক দেখলে তার চাইতে আমায় কিছুদিন পাঠিয়ে দাও।

বিষণ্ণ মনে ক্ষিতীশ বলিল—কোথায় যাবে? মায়ের কাছে? কিন্তু সেও তো পল্লী, এর চাইতে ভাল জায়গা তো হবে না।

কেন, দাদা তো যাওয়ার জন্য কতবার লিখেছেন, বাবা-মায়ের কাছে না হোক দাদা-বৌদির কাছে দিন কতক এলাহাবাদে গেলে তো মন্দ হয় না, এ রকম ভাবে এখানে পড়ে রোগ ভোগ করা আমার পক্ষে শ্রেয় তো নয়ই, তোমার পক্ষেও শ্রেয় নয়। ধীর ভাবেই কথা কয়টা শেষ করিয়া সুরুচি নীরব হইল।

ক্ষিতীশ এ কথার কোন উত্তর করিল না,—বিষণ্ণ শুষ্ক ভাবে সে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতে লাগিল। এত বড় যুক্তির উত্তরে যে আর কিছু বলিবার নাই। তবু তার সমস্ত অন্তরটা নিবিড় বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

এই সময়ে—খোকা কাঁদছে বৌদি—বলিতে বলিতে খোকাকে লইয়া সতীশ ঘরের ভিতর আসিল। পরে সে খোকাকে সুরুচির কোলে দিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছিল সেই সময়ে ক্ষিতীশ বলিল—কথা আছে রে সতু!

সতীশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই ক্ষিতীশ বলিল—

তোর বৌদিকে এলাহাবাদে রেখে আয়, ও যেতে চাচ্ছে। আরো কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, পারিল না। সতীশ দাদার মুখের দিকে চাহিয়া নিমেষে গম্ভীর হইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে বলিল—সত্যি বৌদির দিনকত হাওয়া বদলান দরকার,—বেশ, কবে যাওয়া ঠিক করচেন?

ভারী গলায় ক্ষিতীশ বলিল—তা হলে তাই হোক, ঠিক করা আর কি, কাল বেলা দশটাতেই তোরা রওনা হয়ে পড়।

ইহার পর দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা ও সাংসারিক বন্দোবস্তের বিষয় লইয়াই সে দিনের সমস্ত সন্ধ্যাটা অতীত হইল।

পরদিন সুরুচি যখন ব্যস্তভাবে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি গুছাইতে ব্যস্ত, সময়ও আর বেশী ছিল না, ক্ষিতীশ সেই সময়ে ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া ডাকিল—সুরুচি।

সম্মুখে খোকার জামাগুলি ও খোলা তোরঙ্গটা, সুরুচি মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। ক্ষিতীশ শ্রান্তের মত বলিল—এখান হতে গিয়ে সেখানে থাকতে তোমার ভাল লাগবে সুরুচি? তোমার সংসার তোমার এই সব ছেড়ে।

বিস্মিত ভাবে সহজ কণ্ঠে সুরুচি উত্তর দিল— কেন লাগবে না, দাদা আছে বৌদি আছে, সেখানেও তো আমার সবই আছে।

সব—সবটা কি শুধু—সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেও ক্ষিতীশের মনে হইল সে অনেকখানি পিছাইয়া পড়িয়াছে! পরক্ষণেই কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া বলিল—তাই লাগুক সুরুচি। তুমি ভাল হয়ে ফিরে এস।

তাহার এই কথায় অলক্ষ্যে অদৃষ্ট-দেবতা বুঝি একটু হাসিলেন।

বাহির হইতে সতীশ হাঁকিল—এস বৌদি, গাড়ী এসেছে।

( ৩ )

দীর্ঘ তিন বৎসর পরের কথা।

মা, ও মা, মা? জ্বর তপ্ত শরীরে খোকামণি কাহাকে যেন খোঁজ করিয়া ব্যস্ততার সঙ্গে পাশ ফিরিল। নীলা তাহার মাথায় জলের পটী লাগাইয়া বাতাস করিতেছিল। হাতের পাখা শিয়রে নামাইয়া চিন্তিত বিষণ্ণ মুখে সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল—খোকন্, খোকামণি!

খোকন ঠোঁট ফুলাইয়া কান্নার সঙ্গে বলিল—মা, ও মা, ওই ঝি,—ঝি মারে!

নীলা দেখিল আজ খোকনের জ্বরের মাত্রাটা বেশী, সে সহানুভূতির সঙ্গে বলিল—কোথায় মারে খোকন্!

মারে মা মারে।—ইহার পর পুনরায় সে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। নীলা গভীর আশঙ্কায় শঙ্কিত অন্তঃকরণে পটীটা বদল করিয়া পুনরায় বাতাস করিতে লাগিল। সে আড়াই বৎসর আগে সুরুচির জায়গায় আসিয়া প্রথম দাঁড়াইতেই যে খোকন্‌মণিকে সব চাইতে নিবিড় ভাবে কোলে পাইয়াছে, সেই খোকনের যে আজ আট দিন জ্বর ছাড়ে নাই,—নীলা আর ভাবিতে পারিল না, তাহার চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠিল।

সতীশ একখানা চিঠি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া এই সময়ে তাহাকে জানাইল—দাদা আজ আসছেন বৌদি।

তখন অপরাহ্ন! নীলা মুক্ত গবাক্ষ-পথে একবার দিবসান্তের ম্রিয়মান আকাশের দিকে চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—

আসছেন? যাক—এলে আমি একটু স্বস্তি পাই। খোকার জরটা দেখে আজ আমার বড় ভাবনা হচ্ছে ঠাকুর-পো! ডাক্তার বাবু কি যে চিকিৎসা করচেন—অসমাপ্ত কথায় সহসা নীরব হইল।

সতীশ আসিয়া ধীরে ধীরে খোকার ললাট স্পর্শ করিল, ধীরে ধীরে তার নাড়ীর গতিটা পরীক্ষা করিল, শেষে বলিল—দাদা যদি পয়সার খাতিরে শহরে প্র্যাকটিস্ আরম্ভ না করে আজ গ্রামে এসে বস্‌তেন,—তা হলে আর কিছু না হোক এই দুর্ভাবনাগুলোয় একটু শান্তি পাওয়া যেতো।

বলিয়া একটু নীরব রহিয়া পুনরায় বলিল—আমি আর একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি—কোন্ কোন্ সময়ে টেম্পারেচার কত হয়েছে সেগুলো তুমি ঠিক ঠিক লিখে রেখেছ তো?

নীলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল হাঁ রাখিয়াছে।

সতীশ আর অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ক্রমশ এইরূপ ব্যস্ততার ভিতর দিয়াই আরো কয় ঘণ্টা অতীত হইল। রাত্রি তখন প্রায় দশটা, বাহিরের দিকটা অমাবস্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘরে ওয়াল-ল্যাম্প্‌টা উজ্জল-ভাবে জ্বলিতেছিল। বিছানার উপরে রোগ-বিবর্ণ খোকা, সতীশ ও নীলা—অল্প দূরে চেয়ারের উপর অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণমুখে চিন্তিতভাবে ডাক্তারবাবু বসিয়াছিলেন। আসন্ন বিপদ পাতে মুহ্যমান স্পন্দনহীন এই গৃহস্থের মুখের দিকে চাহিয়া বহিঃপ্রকৃতিও যেন স্তব্ধ নীরবভাবে দাঁড়াইয়াছিল।

সহসা নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া সদর দরজায় আঘাতের শব্দ আসিল। পরক্ষণেই ক্ষিতীশের ব্যস্ত কণ্ঠের ডাক আসিল—সতীশ!

চক্ষের পলকে সতীশ ঘরের বাহির হইয়া গেল, প্রায় দুই মিনিট পরে যখন সে ক্ষিতীশকে সঙ্গে করিয়া ঘরে ফিরিল,—দেখিল—খোকার তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গিয়াছে, এবং সে বিশৃঙ্খলভাবে বলিতেছে—মা, ও মা, মা, কাকা, কাকা, ওই মারে।

বাহিরের অমাবস্যার মত ঘরভরা আলোকের ভিতরেও ক্ষিতীশের চোখের সামনে একটা অন্ধকারের যবনিকা পড়িয়া গেল, কোন রকমে নিজেকে সংযত করিয়া সে খোকার শিয়রে গিয়া ডাকিল খোকা—খোকনমণি।

অন্যবারের মত এবার আর খোকনমণি ক্ষিতীশের ডাকে সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না, সে সমান-ভাবেই বকিতে লাগিল, মা ওই মারে, ওই মারে।

নীলা তাহাকে যেন ধরিয়া রাখিবার জন্যই গভীর আগ্রহে বিছানা হইতে কোলে তুলিয়া লইল। কিন্তু হায়, সে যে তখন সামনের ডাকে সাড়া দিয়াছে, পিছনে আর চাহিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণশূন্য তুষার শীতল দেহটী নীলার কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল। আত্মবিস্মৃত-ভাবে আকুল কণ্ঠে নীলা বলিয়া উঠিল, খোকনি, খোকামণি—আর পারিল না। অগ্নিতপ্ত মুখে ক্ষিতীশ এইবার নীলার কোল হইতে তাহাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইল। রাত্রির গভীরতা জানাইয়া এই সময়ে ঘড়ীটা যেন দ্বিগুণ শব্দে বাজিয়া উঠিল—একটা।

দ্বিতলের বারান্দার রেলিং ধরিয়া শুষ্ক বেদনার মূর্ত্ত অশ্রুহীন ঈষৎ আরক্ত চোখে নীলা চাহিয়াছিল—বর্ষার প্রতিমার মত সদ্যধৌত বনরাজির দিকে। দূরে,—কোন গোপন তরুশাখায় বসিয়া কান্নার সুরেই একটা অজ্ঞাত পাখী মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া আবার থামিতেছিল—বাতাস তাহার বিশৃঙ্খল চুলগুলিকে নাড়া দিয়া অতিরিক্ত বিশৃঙ্খল করিতেছিল।

নীলা!

ক্লান্ত কণ্ঠের আহ্বান গিয়া তাহার এই তন্ময়তায় আঘাত করিল। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল ক্ষিতিশ। ক্ষিতীশ তাহার

মুখের দিকে চাহিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল—সুরুচির স্মৃতি আজ রেখে দিয়ে এলাম নীলা,—আঃ আর পারিনে।

পরমুহূর্ত্তেই সে পাশেরই একখান বেঞ্চে অবসাদগ্রস্ত-ভাবে শুইয়া পড়িল। নীলা রেলিং ছাড়িয়া ধীরে ধীরে তাহার শিয়রে আসিয়া বসিল, ধীরে ধীরে আঙুল দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িয়া দিতে লাগিল, এইরকম অনেকক্ষণ কাটিল। অজ্ঞাত পাখীটা তখনো ঠিক সমান সুরেই ডাকিয়া চলিয়াছে।

এই সহানুভূতি ভরা নীরব স্নেহময় স্পর্শের নিকট, কে জানে কেমন করিয়া ক্ষিতীশের মর্ম্ম দুয়ারের রুদ্ধ আগলটা শিথিল হইয়া পড়িল, সে আবার ডাকিল—নীলা!

শান্ত উদাস কণ্ঠে নীলা বলিল—বলুন।

খোকামণির ফটো—সেখানা কোথায় রেখেছ?

আমার তোরঙ্গের ভিতরে, একটা কাগজের বাক্সে রেখে দিয়েছি। বলিয়া নীলা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার দিকে চাহিল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ক্ষিতীশ বলিল, সেখানা কাল বাইরে রেখে দিও। আর আমি বাইরে বিদেশে যাব না —এখন হতে—একটু থামিয়া কি যেন ভাবিয়া সে পুনরায় বলিল—এখন হতে দেশেই ডিস্‌পেন্সারি করবো আর কি করবো?

একান্ত স্নিগ্ধভাবে নীলা বলিল, আর কি করবেন? কই বলেন নি তো!

আর সেই ডিস্‌পেন্সারি প্রতিষ্ঠা হবে খোকামণির নামে আর তার সামনে থাকবে খোকামণির অয়েলপেণ্ট,—তাই আজ তোমাকে ফটোখান বাইরে রেখে—ক্ষিতীশ সহসা চুপ করিয়া গেল। নীলা শুব্ধভাবে তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল। এই যে অভাবের ব্যথা মানুষের বুকে বাজে, তার বুঝি নামও পাওয়া যায় না, কোনদিন শেষও হবার নয়। সেইজন্যই সঙ্গে সঙ্গে সে এ কথার সহসা কোন উত্তর না দিয়া একটু পরে গাঢ় স্বরে বলিল—আর একটা কাজ করবেন?

কি কাজ?

এই পল্লীর দুঃখী লোক যারা অর্থাভাবে শিশুর চিকিৎসা করাতে পারে না তাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের অমনি চিকিৎসা করবেন?

ক্ষিতীশ বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, পরে অশ্রুরুদ্ধ উদাসকণ্ঠে বলিল—করবো নীলা।

নীলা আর কোন প্রশ্ন বা উত্তর কিছুই করিল না। পূর্ব্বের মত তেমনি ভাবে নীরবে ক্ষিতীশের চুলগুলি নাড়িতে লাগিল। কে জানে কখন্ তার নিজেরও অজ্ঞাতসারে একবিন্দু অশ্রু গিয়া পড়িল ক্ষিতীশেরই বাহুর উপর।

চকিতভাবে মুখ ফিরাইয়া ক্ষিতীশ বলিল, কাঁদচো নীলা?

ব্যস্তভাবে আঁচলে চোখ মুছিয়া নীলা বনের দিকে চোখ ফিরাইল।

ক্ষিতীশ পুনরায় বলিল—কাঁদচো তুমি, কাঁদচো নীলা, এই কান্না কাঁদবার ভয়েই বুঝি সুরুচি আগে হতে সরে গিয়েছে, আর দ্বিধাহীন চিত্তে তোমাকে সেই ভার তুলে নিতে হয়েছিল,—আজ আমার বড় গোল হয়ে যাচ্ছে নীলা, ঠিক করতে পারছিনে খোকার প্রকৃত মা কে?

নীলা নিজেকে একটু সংযত করিয়া একটু পরে বলিল—কি যে বলছেন, একটু ঘুমিয়ে নিন্ দেখি, ক্লান্তিটা একটু দূর হোক।

ক্লান্তি-দূর! বিষণ্ণমুখে ক্ষিতীশ একটু হাসিল।

নীলা পূর্ব্বের মতই বলিল, দেহের ক্লান্তিটা ত একটু দূর হ'বে।

চল, আর কি, তা হলে ঘরে যাই। ব্যথিতস্বরে কথাটা বলিয়া ক্ষিতীশ উঠিয়া পুনরায় ভিত্তিগাত্রে ভর দিয়া বেঞ্চেই বসিল, পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ—বেশ কিছুক্ষণ—এইভাবে অতীত হইল, কেহই কোন কথা বলিল না। এই সময়ে বর্ষার শীকরসিক্ত বাতাস উশৃঙ্খলের মতই আসিয়া তাহাদের বেদনামলিন চিন্তাতপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া গেল। সহসা তন্দ্রাচ্যুতের মত চকিতভাবে ফিরিয়া চাহিয়া ক্ষিতীশ গভীর আবেগে নীলার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—কত বড় ছন্নছাড়াকে কত বড় আকর্ষণ দিয়ে সংসারে দাঁড় করিয়েছ তুমি, সে ত জান না নীলা! সুরুচিও বুঝি এমন দিনে এলে এমন করে বাঁধতে পারত না,—আজ যদি তোমায় না পেতাম,—তাই ভয় হচ্ছে, আবার যদি তোমাকেও হারাই!

---

# চালমাৎ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ

যেখানে ভয় করেছিলাম ট্যাক্সি এসে ঠিক সেইখানেই দাঁড়াল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে গাড়ীখানাকে আমাদের চেনা জায়গাটায় দাঁড় করাবার জন্য চালককে বলতে চাইলুম কিন্তু মুখে আটকে গেল, কারণ সঙ্গে আমার এমন একজন ছিলেন বয়সে অনেক ছোট হলেও এই প্রথম চালেই যাঁর কাছে খেলো হতে পারলাম না।

আমরা থামতে না থামতে ছুটে এসে একজন মুটে আমার ব্যাগটা হাতে করে দাঁড়াল। ছোট সেই ব্যাগটার জন্যও একজন লোকের কোন দরকার ছিল না কিন্তু তারেও বারণ করা হল না।

অতঃপর টিকিট কিনে প্লাটফর্মে গিয়ে, দেখলাম গাড়ী তৈরি। তখনো একটু সময় ছিল—পথ কাটাবার জন্য তাই একখানা খবরের কাগজ কিনে গাড়ীতে উঠলাম। সঙ্গী একখানা কাগজ ত কিনলেনই অধিকন্তু কিনলেন মোটা রকমের কি একখানা বাংলা মাসিক। আমরা বসলে মুটে সেলাম করে দাঁড়াল। আনি ছিল না—চারটে পয়সা তাকে দিয়ে দিলাম। লোকটা তবুও চলে গেল না—মুখের কোণে একটু হাসির আভাষ টেনে ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বলল—হুজুর—

আবার কি? চার পয়সাই ত তোমাদের দস্তুর। আর ঐ ত ছোট ব্যাগ, নিজেই আমি—

বকশিস হুজুর—বলে লোকটা বারের বার এই তৃতীয় বার হাতটা কপালে ঠেকাল।

আর ভাঙান নেই বাপু—বলে আমি ঘাড় নাড়লাম।

আমার আছে—বলে সঙ্গী তাঁর পকেটে হাত দিলেন। সেই হাত বা'র করে লোকটাকে তিনি কি দিলেন দেখতে পেলাম না—তবে বুঝলাম লোকটা খুশী হয়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি দিলে হে যে অমন ঘটা করে সেলাম করে গেল?

সিকি একটা—

সে কি? চা-র-আ-না দিয়ে দিলে একেবারে?

সঙ্গী এ প্রশ্নের কোন জবাব করলেন না—অপরাধীর মত চুপ করে বসে' রইলেন।

দেখে আমি আবার প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা বকশিস ত দিলে, কি হিসেবে দিলে বল ত।

এবার তিনি উত্তর করলেন—হিসাব করে ত দিইনি দাদা—পকেটে হাত দিলাম—সিকিটা উঠল হাতে—তাই দিয়ে দিলাম।

ভাগ্যে টাকা ওঠে নি—উঠলে তাও দিয়ে দিতে—হয় ত?

তা ঠিক বলতে পারিনে—হয়ত দিতাম—হয়ত বা দিতাম না, ঠিক বলতে পারিনে—বলে দ্বিধারভরে সঙ্গী ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

আমি বলতে পারি, তুমি টাকাই দিতে—ঠিক দিতে। বলে সঙ্গী কি বলেন শোনবার জন্য আমি চুপ করলাম।

সঙ্গী কিন্তু কিছু বললেন না। দেখে আমি আবার বললাম—যাই বল, তুমি এখনো ছেলে মানুষ—একটু হিসাব করে খরচপত্র করতে অভ্যাস করা ভাল।

এ কথারও কোন জবাব তিনি করলেন না—সেই মোটা মাসিকখানার ছবি দেখতে লাগলেন পাতা উল্টে উল্টে।

শেষে আমি প্রায় আপন মনেই বলছিলাম—আচ্ছা কি তোমার বিবেচনা বল ত। যার কাজের মজুরি হত চার পয়সা তারে বকশিস দিলে কি না চার আনা! বলিহারি!

সঙ্গী হঠাৎ জবাব করলেন—কিন্তু দাদা আপনিও ত কম দিলেন না—

আমি? আমি বকশিস দিলাম?

মুটেকে দিলেন না বটে কিন্তু রেল কোম্পানীকে ত দিলেন।

অবাক করলে দেখচি—কি বলচ হে—

বলচি এই যে সবুজ টিকিট আপনি যা কিনেচেন—সে শুধু ভাড়ার টিকিট নয়—রীতিমত বকশিস আদায় করে নিয়েচে ঐ দামের মধ্যে।

শুনে মনে হল সঙ্গী তর্ক করতে প্রস্তুত। তাঁর সে ভাবখানা দেখবার জন্য তাঁর দিকে চেয়ে দেখি আনমনে বেশ একখান রংচং-এর ছবি তিনি উল্টে যাচ্ছেন, খেয়াল নেই। আঃ দেখি ছবিখান কি—বলে খপ্ করে মাসিক পত্রখানা সঙ্গীর হাত থেকে টেনে নিয়ে বললাম—আমি ততক্ষণ ছবিগুলো দেখি? কি বল?

আচ্ছা আমি খবরের কাগজখানা পড়চি—বলে সঙ্গী খবরের কাগজখানা হাতে করে ওদিকের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন।

---

# ব্রাহ্মণ

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

হোমশিখা পূতবনে প্রাণযজ্ঞে প্রদানি' আহুতি,
হে ব্রাহ্মণ, উঠেছিলে জাগি' !
নবীন তপস্যা তব স্বার্থরিক্ত মহান্ গৌরবে
ঋজু, শুভ্র জীবনেরে মাগি'
স্নেহে প্রেমে করুণায় সিক্ত করি' চিত্ততটভূমি
ঊর্দ্ধে তোমা করিল বহন ;
আত্মার সে ধ্রুব, স্থির, মহীয়ান্ ধ্যানলোকমাঝে
কবি তোমা' করে আবাহন !

চিরশান্ত সৌম্য বেশ, সুপ্রসন্ন আনন তোমার
মহানন্দে প্রাণজ্যোতি বহি' ;
রাজারে কর নি ভয় ; আপনি যে আপনার রাজা
স্বীয় চিত্তরাজ্যতলে রহি'।
দুর্ব্বাসার বেশে যবে দম্ভ এল ক্রোধ ল'য়ে সাথে,
পরাশর নিয়ে এল কাম,—
আয়োজন বৃথা সেথা। হে দাম্ভিক, হে কামুক নর,
কবি তোমা' করে না প্রণাম !

যেথা' তুমি মৃদু হাসি' প্রাণ দিলে অপরের লাগি'
যেথা দিলে মহাস্বার্থ বলি ;
সেথায় অমর তুমি ; কবি তোমা করিছে প্রণতি
দিয়া পদে ভকতি-অঞ্জলি।
যজ্ঞ যেথা প্রাণহীন, পশু যেথা আর্ত্তকণ্ঠরবে
শক্তিহীন মিনতি জানায়,—
সেথায় চণ্ডাল তুমি, হে ব্রাহ্মণ, হে লোভী ব্রিরাট,
গর্ব্ব তব খর্ব্ব সেথা' হায় !

আজি এই নবযুগে হে ব্রাহ্মণ, উঠ উঠ জাগি'
সর্ব্ব ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে ;
আপন সাধনা বলে তমোহীন শুভ্রতার লাগি'
কর তপ অমানিশাশেষে !
ব্রহ্মেরে জানিবে তুমি আপনার দীপশিখা জ্বালি
জন্ম তব নহে অধিকার ;
আচারের দাস নহ ; গণ্ডী আজি মুছি' ফেলি দাও
সাধনারে নম' বার বার !

শক্তিহীন ত্যাগহীন মন্ত্রহীন জীবন তোমার
ফেলি' দাও পথধূলি' পরে ;
মানুষের অধিকারে ফিরে এস দাম্ভিকপ্রবর
নবযুগ চাহিছে তোমারে !
অধিকার নাহি যা'র, তবু বসি' নির্বিচারে হায়
পদধূলি করিলে প্রদান ;—
আজি সেই অপমান তোমারে যে করিবে আঘাত
শির পাতি' লহ প্রতিদান !

ব্রাহ্মণ উঠিছে হের ধরণীর প্রতি গৃহ হ'তে
প্রতিভার অমল প্রভায় ;
তোমার গণ্ডীর মাঝে আদর্শ সে বদ্ধ নহে, নহে ;
মুক্ত সে যে বিহঙ্গম প্রায় !
বিশ্বেরে সে আমন্ত্রিছে আপনার যজ্ঞশালামাঝে ;
'তুমি আজি দিবে কোন্ দান ?'
তপস্বী আসিছে কত ; জ্ঞানী প্রেমী আসে সারে সারে
সেথা তব নাহি নাহি স্থান !

ব্রাহ্মণ উঠিছে জাগি' হেরিতেছি সম্মুখে আমার,-
নেত্রে তা'র বহ্নিশিখা জ্বলে ;
জন্মে নহে, বংশে নহে ; তপস্যায় অধিকার তা'র ;
আপনারে গড়িছে সবলে।
নবীন পূজারী সে যে বিশ্ব ব্যাপি' চলিছে সবেগে
শান্ত, সৌম্য, পূর্ণমনস্কাম !
স্বার্থ ধীরে বিসর্জ্জি'ছে আদর্শের মহাস্রোত প'রে ;
কবি তা'রে করিছে প্রণাম।

# সুবলবেশে রাইমিলন

( প্রাচীন কীর্ত্তন অবলম্বনে )

শ্রীচন্দ্রকুমার দে

( ১ )

'আমায় খেতে দাও মা, আমার বড় খিদে পেয়েছে।' চকিতের মত নন্দরাণী পেছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—দাঁড়িয়ে কানু। মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিতেছে। ষাট আমার, বাছা আমার বলিয়া যশোদা আনন্দদুলালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার দু' এক বিন্দু চখের জল টপ্ টপ্ করিয়া কানুর লম্বা চুলের উপর গড়াইয়া পড়িল।

আজ সাত দিন কানুর জ্বর—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল মাথার যন্ত্রণা। যশোদা দিনে একশ' বার করিয়া কানুর গায়ে হাত বুলাইতেছেন। কানুর খাবার জিনিষগুলা মা পরাণে ধরিয়া অন্য কাহারও মুখে তুলিয়া দিতে পারেন না। সে গুলি পরম যত্নে শিকায় তুলিয়া রাখিতেছেন। কানু ভাল হইলে নিজ হাতে তাকে খাওয়াইবেন। কানুর জ্বর সারিয়াছে। কিন্তু মাথার যন্ত্রণা সারে না, তার চোখ দুটী খুব লাল।

কানু আরাম হইয়াছে। সে নিজে যাচিয়া মা'র কাছে খাবার চাহিতেছে। নন্দরাণীর মনে আনন্দ ধরে না। ঘরে যত বাছা বাছা জিনিষ—ক্ষীর সর, ননী থালায় করিয়া মাতা নন্দদুলালের সামনে আনিয়া ধরিলেন।

এটা খাও, ওটা খাও—বলিয়া যশোদা পুত্রের মুখে খাবার জিনিষগুলি তুলিয়া দিতে চাহিলেন। কানু আপত্তি করিল—সে নিজ হাতে খাইবে।

ভাণ্ডের সর-নবনী খাইয়া কানু বলিল—মা আমি গোষ্ঠে যাব। আমায় বিদায় দাও! ঐ শুন রাখালের বেণু—আয় কানু, আয় কানু বলে কেমন বাজ্‌ছে! বাস্তবিক ব্রজের পথে তখন রাখাল বালকগণের বাঁশী ভোরের বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া গাহিতেছিল—

"সেজে দে মা নন্দরাণী
তোর নীলমণি যাই গোষ্ঠেতে।"

নন্দরাণী আপত্তি তুলিলেন, না বাছা 'তোর গোষ্ঠে যেয়ে কাজ নেই। পূবের হাওয়ায় আবার জ্বর আসতে পারে। রাখালেরা সব ধেনু দেখবে এখন—তুই ভাল হয়ে নে—তার পর ধেনু রাখতে যাবি বৈকি বাছা!

কানু তার আবদার ধরিল, না মা, আমি গোষ্ঠে যাব—আজই যাব। যমুনার খোলা বাতাসে যে অসুখটুকু আছে তা সেরে যাবে এখন। আমায় শীগ্‌গির বিদায় দাও, ঐ দেখ—

"শ্যামলী ধবলী চলে ঢলাঢলি
গোষ্ঠ-কানন পথে গো!"

আমার মন বড় উতলা হয়েছে, আজ সাত দিন ধরিয়া আমি জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখে বঞ্চিত!

মাতা জানিতেন, আদুরে ছেলে যে বায়না ধরিবে, প্রাণান্তেও মত বদলাইবে না! কিন্তু মায়ের পরাণ—কি জানি অসুখ যদি আবার বাড়ে। নন্দরাণী কানুর কচি লাল লাল ঠোঁট দুখানি ধরিয়া বলিলেন, তোর চোখ

ছু'টী কেমন ছল ছল কর্‌ছে—বোধ হয় ভাল ঘুম হয়নি, কাল রাত্রে কোথায় ছিলে বাবা?

কান্থ অম্লান মুখে বলিল, স্ুবলদাদার সঙ্গে।

কান্থ এখন আর ব্রজধামের ননীচোরা গোপাল নহে। সে কৈশোরে পা দিয়াছে। আজ কয়েক দিন ধরিয়া সে রাত্রিতে মায়ের সঙ্গে এক ঘরে শোয় না।

"পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় নিশীথে নিকুঞ্জবনে গো!"

যশোমতি কিন্তু তাহার খোঁজ রাথেন না। আজ কয়েক দিন হইল কান্থর সম্বন্ধে ব্রজধামে একটা কথা রটিয়াছে—কথাটা তত ভাল নয়—সত্য মিথ্যা আমরা জানিনা। পদকর্ত্তা গাহিতেছেন—

'এক জানে কুঞ্জের কোকিল—
আর জানে সে তাল তমাল।'

( ২ )

পূর্ব্বরাগ—তা কথাটা এই। একদিন গোকুল কমলিনী শ্রীরাধিকা যমুনার জলে নাইতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে আসিয়াছিল—

"ললিতা বিশাখা আর চারু চন্দ্রাবলী।"

ছুই তীরে তাল তমালের বন। মাঝে মাঝে সপুষ্প কদম্বতরু। নিবিড় পত্রাবলীর ফাঁকে ফাঁকে বার মাস বৃন্দাবনের কদম্ব ফুল ফুটিতে থাকে। তাদের শীত গ্রীষ্ম নাই। ফুলভরা চম্পকগাছ—ময়ূর ময়ূরী নাচিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া যায়। তারা মেঘের ডাকে পেখম ধরে না। যথন কান্থর বাঁশী যমুনাপুলিন মুখরিত করিয়া বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তোলে, সঙ্গে সঙ্গে নীল সলিলা যমুনা ভাটীয়াল গতি ছাড়িয়া উজান বয়—তখন কদম্বের শাখায় শাখায় তমালের ডালে ডালে নৃত্যশীল ময়ূর ময়ূরীগণ ইন্দ্রধনু স্থষ্টি করে। সেই বাঁশরীর তালে তালে ফুলের কলি সকল ফুটিয়া উঠে—ভ্রমরের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া যায়। অধরে পুষ্পহাসি নিয়া কুঞ্জমাধবী নিধু-দ্রুমকে জড়াইয়া ধরে। সুপ্ত কোকিলের কণ্ঠে পঞ্চমের তান ধ্বনিয়া উঠে। সেই গোকুলপাগলকরা বাঁশীর তান শুনিতে শুনিতে 'ব্রজাঙ্গনাগণ জলের উপর যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন—কোথা হইতে উজান যমুনার ঢেউ আসিয়া তাদের কাঁকের কলসী দূরে ভাসাইয়া নেয়। বলিতে কি সমস্ত ব্রজধাম যেন সেই বাঁশীর তালে তালে কথনও বা স্বপ্নাভিভূতের মত চৈতন্য হারাইয়া আবার বাঁশীর তানেই জাগিয়া উঠে।—

"এই কান্থর বাঁশী ব্রজের সোনার কাটি রূপার কাটি।
কত মধু ধরে বাঁশীর অন্তরে—
কি যাছু বা জানে বাঁশী গো॥

পীবরযৌবন ভারাক্রান্তা ব্রজ যুবতীগণ যমুনার নীল তরঙ্গে যৌবনতরঙ্গ ভাসাইয়া সাঁতার কাটিতেছেন। তাঁহাদের পদসঞ্চালিত যমুনার জল মুক্তামুষ্টির মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। তাঁহাদের পায়ের অলক্তক রাগে যমুনার নীল জল লাল হইয়া যাইতেছিল। এর মধ্যে বিশাখা চিত্রার সঙ্গে আড়ি ধরিয়া সাঁতার দিতেছিলেন। কে হারে কে জিতে। ছুইটী পুষ্পিত পদ্মতরণী যেন যমুনার উজান স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। চন্দ্রাবলী বেশী সাঁতার কাটিতে শিখেন নাই—ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া সহচরীগণের সন্তরণপটুতা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বৃন্দা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মুখের জলধারা ফুৎকারে ইন্দ্রধনু স্থষ্টি করিতেছিলেন।

আজ মাত্র কয়েক মাস হইল রাধার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এম্নিই তিনি সহচরীগণের বাক্যজ্বালায় অস্থির—তাই সেই ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা সলজ্জা সুন্দরী শীঘ্র শীঘ্র স্নানের কাজ সারিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া সঙ্গিনিগণের জল-কেলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার সঞ্চিত কেশ-রাশী বাহুপৃষ্ঠে বক্ষবাহিয়া মুক্তবেণী মেঘের মত শোভা পাইতেছিল। ঈষৎ হাস্যময় আর্দ্রমুখখানিতে প্রভাতের তরুণ সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। গলিত কাঞ্চনের মত তাহার কিশোর দেহের গৌর গরিমা নীলাম্বরীতে ঢাকা পড়িতেছিল না। তুষারভেদী সূর্য্য-রশ্মির মত যমুনার ঘাট আলো করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। গায়ের আর্দ্র নীলাম্বরীখানি খুলিয়া রাখিয়া রাই তীর রক্ষিত বসনখানি টানিয়া আনিতেছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার চোখছুটী তমাল বৃক্ষের দিকে পড়িল।—

"ছাড়িয়া গগন, কালো মেঘ যেন
যমুনা পুলিনে লুটে গো।"

রাধা আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিলেন না। তমালতল হইতে আর দুটী বাঁকা নয়ন এমন ভাবে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। সেই যে বাঁশীর গান রাধা জীবনে অনেকদিন শুনিয়াছেন—রাধা মনে মনে চিন্তা করিতেন "না জানি কেমন জনে, এমন বাঁশী বাজায় বনে" এই বংশীধারীকেও রাধা যে না দেখিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু এমনি নব প্রভাতে—যমুনা পুলিনে—পুলকিত যৌবনে—আর্দ্রবসনে—তমালের বনে—বুঝি কোন দিন তাহাকে দেখেন নাই। মরি মরি কি রূপ—

"নয়ন বাঁকা তার ভঙ্গি বাঁকা
(ও) তার চূড়ার উপর ময়ূরপাখা
নয়ন বাঁকা তার ভঙ্গি বাঁকা॥"

হরিণী যেমন বুকে বিষের তীর খাইয়া বন ভাঙ্গিয়া পালায়, সহচরিগণের সঙ্গে রাধা তেমনি সকাল সকাল গৃহে ফিরিতেছিলেন—আবার সেই মুগ্ধ দৃষ্টি তমাল তরুর দিকে পড়িল। সেই দুটী নয়ন। একখানি নূতন মেঘে যেন দু'টী উজ্জল তারা ফুটিয়া রহিয়াছে। রাধা জোর করিয়া চোখদুটী ফিরাইয়া লইতেছিলেন কিন্তু ঘরে ফিরিতে যেন তাঁহার পা উঠিতেছিল না।

"ফিরি ফিরি করি ফিরিতে না পারি
বসনে কাঁটায় ধরে—
মাটি হইল নাঠা পায়ে বিধায় কাঁটা
কেমনে যাইব ঘরে।"

রাধার বুকের কথা অনেকখানি, কিন্তু আজ ত তা ভাষায় বলিবার নয়। বুকের দরদ যখন ভাষায় ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে না তখন বিধাতা সে শক্তি দেন নয়নকে। তখন একমাত্র চাহনি ভঙ্গিমাই অন্তরের অব্যক্ত ভাষা ফুটাইয়া দিতে পারে। রাধার বুকের বেদনা দুইটী নীল নয়নে ফুটিয়া তমাল তলে তাহার চিরারাধ্য দেবতার চরণে নীরব নিবেদন জানাইয়া গেল। কিন্তু সে খবর সহচরিগণ কেহ রাখে না। ব্রজের পশুপক্ষী 'কেউ জানেনা—

"এক জানে কুঞ্জের কোকিল,
আর জানে সে তাল তমাল।"

৩

সেইদিন আয়ান ঘোষের বাড়ীর পথ দিয়া বাঁশী বাজিয়া যাইতেছিল—

"নিশিকালে সঙ্গোপনে।
যেয়ো রাধে নিধুবনে॥"

তখন সন্ধ্যাকাল। ব্রজ-বধূরা গোয়ালের সাঁজালে আগুন ধরাইয়া সবে মাত্র দীপ জ্বালাইবার আয়োজন করিতেছিল। পল্লিধূম বাঁশবনের শ্যামলতার উপর, ধুঁয়ার আঁচলখানা উড়াইয়া দিয়া সাঁঝের আকাশে মিশিয়া যাইতেছিল। আয়ান ঘোষের বাড়ীর পিছনে সমাগত পাখীরা কলরবে যে যার রাত্রিবাসের আশ্রয় খুঁজিতেছিল। খঞ্জনের নাচ তখনও থামে নাই।

রাধা ননদিনীর তাড়া খাইয়া তৈলসলিতা নিয়া গৃহে দীপ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিলেন, অকস্মাৎ হাত হইতে সমস্ত উপকরণ মাটিতে পড়িয়া গেল। দন্ত কড়মড় করিয়া কুটিলা শ্রীরাধাকে নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা করিল। তার যতটা রাগ নয় ঐ রাধার উপর, তার চেয়ে হাজার বেশী রাগ ঐ বাঁশীটার উপর। কাল নাই অকাল নাই, সন্ধ্যা নাই নিশি নাই—ভণ্ড ছোঁড়া পথে ঘাটে বাঁশী বাজিয়ে ফেরে! কুটিলা ভাবিতে লাগিল—আর একদিন কানুকে খুব শক্ত করিয়া বলিয়া দেবে—সে যেন আর তাদের বাড়ীর মুখো না আসে!

গভীর রজনীতে নিধুবনের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। তার উদাস স্বরলহরী বৃন্দাবনের উপর দিয়া যমুনার বক্ষ বাহিয়া দূর দিগন্তে ছুটিয়া চলিল। তালতমাল শিহরিয়া উঠিল। কুঞ্জের পাখীরা জাগিয়া গাহিল। ব্রজবাসীরা সেই বাঁশীর তান শুনিতে শুনিতে কেউবা ঘুমাইয়া পড়িল—

"আর কেউবা উঠিল বসি।"

সেদিন আয়ান ঘোষ বাড়ীতে ছিল না। এক পার্শ্বে কুটিলা আর এক পার্শ্বে জটিলা—মধ্যে কমলিনী কাঁটা বনের পুষ্পের মত পড়িয়াছিলেন। তাঁর চক্ষে নিদ্রা নাই। যে বুকখানি নিয়া রাধা আজ জলের ঘাটে গিয়াছিলেন—সব খালি করিয়া তাহা হারাইয়া আসিয়াছেন। তমাল

তলের চোখ ছুটি খড়ের চাল ভেদ করিয়া যেন তাঁহার চক্ষের সামনে আকাশের তারার মত ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই নবীন মেঘখণ্ডকে রাই যদি আর একবার দেখিতে পাইতেন তাহলে তৃষ্ণার্ত্ত চকোরীর মত সেই মেঘের রাজ্যে উধাও হইয়া মিশিয়া পড়িতেন!

"কান্দে রাধা বিনোদিনী
ছুই চক্ষে বহে পানি
শাড়ীর আঁচল ধরি মুছে গো!"

কিন্তু সেই কুলনাশা বাঁশী আর থামিল না। সহসা ঘুমের ঘোরে কুটিলা ছুষমন বাঁশীর আওয়াজ শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। কি বিশ্রী স্বর, পাশ ফিরিয়া কুটিলা বিছনায় হাত দিয়া দেখিল সব খালি। এক পার্শ্বে বুড়ী জটিলা পড়িয়া নাক ডাকাইতেছে। ত্রস্তহস্তে কুটিলা আলো জ্বালিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু রাধা নাই। গৃহের উন্মুক্ত জানালা কুটিলার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া যেন রাধার পলায়নের সাক্ষ্য প্রদর্শন করিল। বাহিরের পথে একটা মালা, বোধহয় অনবধানতায় মালিনীর অঞ্চলচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া হাসিতেছিল, ঘৃণায় বিরক্তিতে সেই মালা তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। পরদিন নবীন সূর্য্যের কিরণ তেজস্বী হইতে না হইতে পাড়া জুড়িয়া রাধার কলঙ্ক কথা রটিয়া গেল। কথাটা রটাইল কিন্তু কুটিলা। সত্য মিথ্যা আমরা কিছু বলিতে পারিব না।

"একজানে সে কুঞ্জের কোকিল
আর জানে সে তালতমাল।"

৪

বলিতেছিলাম সেই গোষ্ঠের কথা। রাখাল-বেণুর তালে তালে পা ফেলিয়া ধেনুবৎস চলিয়াছে। আগে চলিয়াছে শ্যামলী ধবলী। ধেনুর মধ্যে ইহারাই শ্যাম সোহাগী। শ্যামলীর গলায় কড়িফুল, ধবলীর শৃঙ্গে বকুল ফুলের হার জড়ানো, গলায় অতসী ফুলের মালা। ধেনু সকলের পিছনে বৎস সকল নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। আজ মূক পশু জাতির মনেও আনন্দ ধরে না—তাদের আনন্দছুলাল গোষ্ঠে আসিয়াছে।

আর রাখাল বালকগণের ত কথাই নাই। আজ তাহারা নির্ভয়। কানুর শক্তিতে তাদের অগাধ বিশ্বাস। এই কানু সুপ্ত অজগরের মাথায় পা দিয়া নাচে। শূন্যে মিশিয়া অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কালীয় দমন করিয়া অজগরের ভয় হইতে, বকদৈত্যকে মারিয়া অসুরের হাত হইতে বৃন্দাবনকে রক্ষা করিয়াছে। শুধু কি তাই! কানু বলিয়া রাখিয়াছে; সে বড় হইলে কংসকে মারিয়া নিজেই মথুরার রাজা হইবে। তাহলে ত আর কোন ভয়ই নাই। আনন্দে রাখালের বাঁশী সমস্বরে "কানুর জয়" গাহিতে গাহিতে বৃন্দাবনের রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

যেখানে নীল সলিলা যমুনা আপন নীল জলরাশি লইয়া প্রেমে নাচিয়া সোহাগে হাসিয়া কল কল্লোলে উজান বহিয়া চলিতেছিল—তাহারই তীরে গোষ্ঠভূমি। নবীন শষ্পরাজি গালিচার মত সুন্দর করিয়া কে যেন পাতিয়া রাখিয়াছে। শিশির সিক্ত শ্যামল দূর্ব্বাদলের মাঝে মাঝে তরুণ সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া হিম বিন্দুগুলি ঝরে-পড়া পুতির মালার মত চকমক করিতেছে। কোথাও পুষ্পতৃণ সকলে নানা বর্ণের বিচিত্র ফুলসকল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল দলিত মথিত করিয়া ধেনু সব চলিয়াছে। বেণুর তালে তালে তাদের গলদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টাসকল কি সুন্দর বাজিয়া উঠিতেছে।

যমুনার ঠিক পারেই প্রান্তর। একটি উচ্চ যায়গায় কয়েকটি কদম্ব ও কয়েকটি তমাল তরু। তারই ছায়ায় বসিয়া রাখাল বালকেরা কৃষ্ণকে রাজা সাজাইয়া খেলা করে। আজ সাতদিন পর কানু গোষ্ঠে আসিয়াছে। রাখাল বালকের আনন্দ ধরে না। কেউ বা নানা জাতি ফুল তুলিয়া কানুর জন্য মালা গাঁথিতে লাগিল। কেউবা কানুর জন্য ফল আনিতে বনে ছুটিয়া গেল। কেউবা ধেনু সকলের গতি বিধি নিরীক্ষণ করিবার ভার গ্রহণ করিল।

এর মধ্যে শ্রীদাম আসিয়া বলিল—'কিরে ভাই কানু! আজ তোকে এমন মন-মরা দেখাচ্ছে কেন? তোকে ত এমনটি কখনও দেখি নাই; বসুদাম আসিয়া আক্ষেপ

করিয়া বলিল, আজ সাত সাতটা দিন ধ'রে তোকে পাইনে, এই সাতটা দিন আমাদের কি কষ্টেই না গেছে; তুই আমাদের বৃন্দাবনের চাঁদ। তোর মুখখানি মেঘে ঢাকা দেখ্‌লে আমরা যে বাঁচিনে ভাই! ঠিক্ এই সময় স্থদাম ত্রস্তভাবে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, কানু ভাই—সর্ব্বনাশ হয়েছে! শিগ্‌গির তোর বেনুটা বাজা। ধেনুবৎস বিশৃঙ্খল হয়ে যমুনার পার দিয়ে মথুরার পথে ছুটে চলেছে! জানিস্ ত ভাই মথুরার ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বনিবনাও নেই, তারা ধেনু বৎসগুলি ধরে নিয়ে এখুনি মথুরার রাজার কাছে হাজির করবে, তাহলে সর্ব্বনাশ! ঠিক্ সেই সময় আরও কয়েকটি ছেলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—কানুদাদা, তোমার শ্যামলী ধবলী যমুনা পার হয়ে চলে গেছে! আমরা বাঁশী বাজিয়ে কত ডাকলুম—ফিরলে না। একবার তোমার বাঁশীটি বাজাও ভাই তা'নইলে আজ ধেনুগুলোকে সাম্‌লে রাখার কারও সাধ্য নাই!

এমন সময় একটা বনফুলের মালা সহ স্ববল আসিয়া কানুর গলায় মালাটি পরাইয়া দিল। কিন্তু কানুর মুখে হাসি নাই। আজ বৃন্দাবন-চন্দ্র মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে! স্ববল অবাক হইয়া বলিল, ভাই কানু আজ তোকে এমন ধারা দেখ্‌ছি কেন! কি হয়েছে খুলে বল্ না ভাই! তোর দুঃখ দূর করতে ব্রজের রাখালরা প্রাণ দিবে এখন! একবার তোর বাঁশীটি বাজা ভাই—আমরা ব্রজের রাখাল তোর বাঁশী শুনে প্রাণ জুড়াই।

কানু কোনও উত্তর করিল না। ছল ছল নয়নের দু'এক বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া রাখাল বালকেরা চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। স্ববল বলিল, ভাই কানু তোর বাঁশীটি কোথায়! কানু ধীরে ধীরে বলিল—

"সবে বলে দোষী কুলনাশা বাঁশী
কলঙ্ক ডাকিয়া আনে গো।"

আমি সেই কুলনাশা বাঁশী আজ সকালে যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। আর বাঁশী বাজাব না! কানুর এই কথায় চাঁদের হাট ক্রন্দনের রোলে ভরিয়া গেল—গোষ্ঠের আনন্দ উৎসব সব চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল!

ভিতরের গুমরটুকু ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য স্ববল কানুকে নিয়া নিধুবনে প্রবেশ করিল। ধেনু রক্ষার ভার পড়িল শ্রীদামের উপর!

৫

অদূরে ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভী নিধুবন। রাত্রিতে আকাশে যেমন তারা ফুটে, তেমনি লতার মুখ আলোকিত করিয়া নিধুবনে নিশিপুষ্পসকল ফুটিয়া উঠে, আর দিনের বেলায় নিধুবনের অফুরন্ত শোভা। যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া তাল তমালের সারি। মাঝে মাঝে নানা জাতি ফুলের গাছ, গাছে গাছে ফুল। ফুলে ফুলে ভ্রমর নিদ্রালসে কোনটী বা মধু খাইয়া ফুলের বুকের উপর পড়িয়াই ঘুমাইতেছে। কোনটীবা গুন্ গুন্ স্বরে উড়িয়া পড়িয়া কুসুমের মুখ চুম্বন করিতেছে। আজ দিনের বেলায় নিধুবনে সহসা বিধুর উদয়। গলায় বন ফুলের মালা। সেই নবীন নীরদকান্তি দেখিয়া উল্লাসে ময়ূর ময়ূরীগণ তমালের শাখায় উড়িয়া পড়িয়া নাচিতে লাগিল। কুঞ্জের কোকিল গাহিয়া উঠিল। সপুষ্প মাধবীলতা সহসা তরু-শাখা হইতে খসিয়া পড়িয়া আদরিনী প্রিয়ার মত মাধবের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। মাধব ধীরে ধীরে সেই পুষ্পলতাকে যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া রাধাকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইলেন।

এই রাধাকুণ্ড কানুর অতি প্রিয় স্থান। চাঁদের কিরণের মত জলরাশি মৃদুতরঙ্গে থৈ থৈ নাচিতেছে। জলের উপর পদ্ম কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্পসকল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। তীরে তাল-তমাল বন। তাহাতে বসিয়া কুঞ্জকোকিল গাহিতেছিল—নিধুবনে চির বসন্ত বিরাজিত!

রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া স্ববল জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাই কানু তোর মনের কথাটী একবার খুলে বল দেখি—সহসা তুই এমন হ'লি কেন? তুই না হাসিলে যে বৃন্দাবনের মুখের হাসিটি মিলিয়া যায় ভাই। তুই কচি

বয়সে এত বিহ্বল হলি কেন? কানু সেই 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়ে—

"রা-রা বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
রাধাকুণ্ডের তীরে গো,
মুখে নাহি শব্দ সকলি নিঃশব্দ
সাপে কি খাইলে তারে গো।"

সুবল রাধাকুণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি জল আনিয়া কানুর চোখে মুখে সিঞ্চণ করিতে লাগিল। তাহার কানে কানে রাধার নাম শুনাইল। কানু চেতনা পাইয়া বলিল—ভাই সুবল, আমার রাধাকে এনে দাও, রাধা বিহনে যে প্রাণ আমার বাঁচে না—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহে না।

"আজ দুই দিন ধরি না হেরি পিয়ারী
শ্রীমুখ কমল কান্তি গো!"

যদি না পাই তবে এই রাধা বলিতে বলিতে আজ রাধাকুণ্ডের জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। ব্রজের খেলার এই শেষ।

সুবল বিপদে পড়িলেন। কি সর্ব্বনাশ—অনেক করিয়া কানুকে বুঝাইতে লাগিলেন।

"তুমি ত পুরুষ সে যে কুলবধু
কলঙ্কের আছে ভয় গো।"

কুলের বধু কেমন করিয়া ঘরের বাহির হইয়া বনে আসিবে, তাতে আবার দিন দুপুরে। কানু সে সব মানিতে চায় না, সে চায় রাধাকে। দেখি কি করিতে পারি বলিয়া, সুবল বনের পথ ধরিয়া চলিল।

৬

নিধুবন অতিক্রম করিয়া গোকুলের আঁকা বাঁকা গ্রাম্য পথ ধরিয়া সুবল অতি সন্তর্পণে আয়ান ঘোষের বাড়ীর সুমুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া আয়ানের প্রতিবেশীরা সব কানাকানি করিতে লাগিল—

"পীতধটি পরা কেরে ওই ছোঁড়া
বেড়ায় গোকুলের পথে রে—"

নিশ্চয় এ কানুর চর। কেউবা হাসিয়া রসিয়া বলিল—আয়ান ঘোষ চিরকালটা মথুরার হাটে ঘোল বেচিয়াই খাইবে আর তার ভাণ্ডের ননীমাখন খাবে—নন্দের ননী-চোরা গোপাল।

বাস্তবিক সেদিন আয়ান ঘোষ দধি বেচিতে মথুরার হাটে গিয়াছিল। কংস রাজার পিতৃশ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ খুব জমকাল রকমের হইবে। অতিরিক্ত লাভের আশায় নানাদেশ হইতে গোয়ালারা সব দধি বেচিতে মথুরায় ছুটিয়াছে। রব শুনিয়া আয়ানও তথায় গিয়াছে। সঙ্গে গিয়াছে কুটীলা। হাবা ছেলে আয়ান—নইলে দর-দস্তুর করবে কে?

একে ত চোর তায় আবার ভাঙ্গা বেড়া। সুবল একবারে যাইয়া আয়ান ঘোষের আঙ্গিনায় দাঁড়াইল। বুড়ী জটিলা তখন চিনি পাতা দৈ নিয়া খুব ব্যস্ত-সমস্ত ছিল। বুড়ী চোখে মুখে বড় দেখে না। সুবল তাহার কাছে গিয়া বলিল—পিসিমা আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে—একটু জল খেতে চাই। বুড়ী দধির কাজে এমনি ব্যস্ত ছিল—সে মুখে কিছু না বলিয়া হাই তুলিয়া রন্ধন গৃহটি দেখাইয়া দিল। সুবল রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল রাধা ডালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছে। তার চক্ষে জল—

"শ্যামের কারণে
ধূয়ার ছলনে
কান্দিয়া ফুলায় আঁখি।

সুবলকে দেখিয়া রাধা বলিল, সুবল এমন অসময়ে তুমি এখানে কেন? আমার কেলে-সোনার খবর ভাল ত? আজ দুই দিন ধরিয়া কুঞ্জনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই—

"শাশুড়ী ননদী হল প্রতিবাদী
পথেতে দিয়াছে কাঁট।"

সুবল, আমি কলঙ্ক কাজল করিয়া চক্ষে পরিয়াছি। কুল মানের ভয় রাখিনা। বল, মাধব আমার কুশলে আছে ত?

সুবল তখন রাধাকুণ্ডের সকল অবস্থা রাইকে খুলিয়া বলিল—

"রা-রা, রা-রা বলি পড়িয়াছে ঢলি
সাপে কি খাইল তারে গো
আছে কিনা আছে কেউ নাই কাছে
ওঝার লাগিয়া আসি গো।"

রাধা, তুমি নাকি মন্ত্র জান! তোমার মন্ত্রে নাকি সাপে-কাটা মানুষ ভাল হয়! তুমি শীঘ্র যাও আমাদের প্রাণ-কানুকে বাঁচাও।

"আমি কেমনে যাব।"

সুবল আমি কেমন করিয়া যাই। আমার একটা উপায় স্থির করিয়া দাও—

"রাঁধন বাড়ণ সহেনা এখন
ঘর গরল-জ্বালা
আমি কানুর লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
পরিব কলঙ্ক মালা।"

সুবল বলিল—এক কাজ কর, আমার এই ধড়া চূড়া পরিয়া তুমি বনে যাও—আমাকে তোমার শাড়ী চূড়ী দাও। কিন্তু ইহাতে এক গণ্ডগোল উপস্থিত—কিরূপে বেশ বদলাইবে!

"এক বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নাই
লজ্জা নিবারিব কিসে গো।"

দশেন্দ্রিয় যখন মনে প্রাণে একযোগে কোন কাজ করিতে যায় তখনই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।—তখন নিতান্ত উপায়-বিহীনেরও পথ খুঁজিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। রাধা কিছু মাত্র না ভাবিয়া না চিন্তিয়া তাহার বিশাল কেশরাশি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল। তৎপর ধীরে ধীরে অঙ্গ হইতে পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া সুবলকে পরিতে দিল। রাধা কেশ চূড়ার আকারে বাঁধিয়া ধটি পরিয়া পাচনী হস্তে ঘরের বাইরে আসিলেন। কিন্তু রাখালের সাজে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা পড়িল না।

"তখন অঙ্গনে নাচিতেছিল নবীন বাছুরী
বুকেতে তুলিয়া তারে লইলেন কিশোরী॥"

এইরূপে কিশোরী রাখালের চূড়াধড়া পরিয়া রওনা হইলেন। কিন্তু সুবলের অবস্থা কি! রাধাত একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিলেন না। আজ যদি সুবল ধরা পড়েন তবে মথুরার গারদ যে তাহার অনিবার্য্য।

৭

সুবলের সন্ধান মতে ছদ্মবেশী রাধা রাধাকুণ্ডের তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি কুঞ্জের কোকিল ডাকিয়া উঠিল। ময়ূর ময়ূরী নাচিতে লাগিল, ফুলের কলি ফুটিয়া উঠিল। সহসা পদশব্দ শুনিয়া মাধব চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুবল। কৃষ্ণ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না,—সুবল তুমি ফিরে এলে—আমার রাধা কোথায়?

"(তখন) ছদ্মবেশী সুবল বলে শুনহে কানাই
(আমি) ঘরে ঘরে তালাস করে না পাইনু রাই।"

আমি গোকুলের ঘরে ঘরে তল্লাস করিয়া আসিয়াছি কোথায়ও রাইকে খুঁজে পাইলাম না—

"কেহ বলে রাই প্রাণে বেঁচে নাই—
মরেছে যমুনার জলে।"

আমি যমুনার পাড়ে পাড়ে তল্লাস করিয়া দেখিয়াছি—রাই নাই—

"কেউ বলে রাই প্রাণে বেঁচে নাই
একি হল সর্ব্বনাশ।
নিশি নিরজনে তমালের বনে,
গলায় বেঁধেছে ফাঁস॥

আমি সেই তাল তমালের বনও তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি রাইকে ত পেলাম না।

শ্রীকৃষ্ণ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন, আবার চেতনা পাইয়া রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন—

"ছদ্মবেশী সুবল বলে শুন ওহে কানু
চন্দ্রাবলী ব'লে একবার বাজাও দেখি বেনু"

কেন, চন্দ্রাবলীইত আছে, রাধা যদি মরে থাকে তার শোক ত চন্দ্রার মুখ দেখেই পাশরিতে পারিবে। রাধা অপেক্ষা চন্দ্রাই ত তোমার সমধিক প্রিয়তমা। একবার বাজাও ওই মোহন বেনু—চন্দ্রাবলীর নাম ধরিয়া বাজাও।

দেখি ও রাধা নামের সাধা বাঁশী চন্দ্রাবলীর নামে কেন বাজে।

সুবলের সেই নিদারুণ পরিহাসে ব্যথিত মাধব রাধা কুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিতে যাইবেন—এমন সময় রাধা আলিঙ্গন পাশে প্রিয়তমকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাধার প্রেমালিঙ্গনে মাধবের মনে কি যেন একটা আসন্ন মিলনের আবেশ আনিয়া দিতেছিল। যখন ছদ্মবেশ ধরা পড়িল তখন আবার কুঞ্জে পাখীরা গাইয়া উঠিল। ময়ূর ময়ূরী নাচিতে লাগিল,—বনলতা হাসিতে লাগিল। নিধুদ্রুম সকল যেন পত্র মর্ম্মরে করতালি দিতে লাগিল। রাধা নিজহস্তে নবকিশলয় সকল সহ শয্যার উপর পুষ্পরাশি ছড়াইয়া দিল। সেই নব বসন্তে প্রেম কুঞ্জের মিলন শয্যায় কমলিনী প্রিয়তম মাধবকে বুকে লইয়া শয়ন করিলেন।

"নয়নে নয়ন অধরে অধর ভালে মিশিল ভাল
ভুজে ভুজলতা হৃদয়ে হৃদয়ে গোরায় মিশিল কাল"।

আত্মা যখন অভিন্ন হয় তখন দেহ ভিন্ন থাকিতে পারে না। প্রকৃতি পুরুষ সেই নিবিড় মিলিত চুম্বনে এক হইয়া গেল। কাম কলঙ্ক সব প্রেম সাগরে বিলীন হইয়া গেল। সে দৃশ্য যে দেখিল তার জনম সার্থক হইল। এক দেখিল,

"কুঞ্জ কোকিল—আর দেখিল তাল তমাল।"

---

# যৌবন-বিদায়

( পুশ্‌কিন্ )

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

পাত্র-অবশিষ্ট শেষ মদ্যবিন্দু-সম তিক্ত অতি
যৌবন-মত্ততাময় অতীত দিনের স্মৃতিভার,
সে তিক্ততা প্রতিদিন তিক্ততর হয় অনিবার
আমার জীবন যবে ঢলে পড়ে অস্তাচল-প্রতি।
অন্ধকার পথ মোর—ভবিষ্যৎ রয়েছে গোপনে
কৌতূহল-আশঙ্কার সুবিরাট্ মহাসিন্ধু-প্রায়!
বন্ধু মোর! আমি চাই বেদনারে বহিবারে মনে
করিতে সৃজন আর বাঁচিয়া রহিতে এ ধরায়।
জানি আমি বেদনায় পাণ্ডুর, মলিন এই ভবে
দুঃখ-শোক-ব্যথা-মাঝে আনন্দ-উচ্ছ্বাস তবু র'বে।
একবার পুনঃ আমি সুধাময় সুর করি' পান
আমারি রচিত গানে অশ্রু-সিক্ত করি' ল'ব প্রাণ;
তারপর শেষক্ষণ ঘনাইয়া আসিবে যখন,
বিদায় হাসিতে প্রেম উজলিবে সন্ধ্যার গগন।

---

# দিলীপকুমার

[ ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শের পরিচয় প্রদান ও প্রচার কল্পে য়ুরোপ ও আমেরিকার রসজ্ঞ সুধীমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় আবার য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন। দিলীপকুমার তরুণ বাংলার জাগ্রত রূপের অন্যতম প্রতিনিধি। তাঁর এই আমন্ত্রণে বাংলার সমস্ত তরুণের একটা আনন্দের গৌরব-বোধ জড়িত আছে। এই গৌরব-বোধের স্বীকার স্বরূপ গত ৮ই ফাল্গুন রবিবার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউট হলে সাধারণ ভাবে দিলীপকুমারকে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য এক বিরাট সভা হয়। শিষ্য-গর্ব্বে চিরপ্রফুল্ল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন। আনন্দের অভিনন্দনে, সুমধুর সঙ্গীতে ও আলাপে সভা কার্য্য অত্যন্ত সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দিলীপকুমারকে শুভ ইচ্ছার প্রতীক-স্বরূপ মাল্য ও রৌপ্য আধার প্রদান করা হয় ও তৎসঙ্গে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে একটি মানপত্রও উপহার দেওয়া হয়। দিলীপকুমার তাঁর স্বাভাবিক সুমিষ্ট ভাবে একটি বিদায় অভিভাষণ পাঠ করেন। পর্য্যায়ক্রমে সেগুলি নিম্নে পত্রস্থ করা হইল।

দুঃখ ও দৈন্যের অমোঘ আঘাতে জাগ্রত বাঙলার তরুণ প্রাণের একান্ত শুভ ইচ্ছা বিদেশের দুর্গম পথে তাঁর সাথী হোক। জয়রথের প্রত্যাবর্ত্তনের পথের দিকে বন্ধুর দৃষ্টি জাগ্রত রহিল। কঃ সঃ ]

( মানপত্র )

প্রীতিপ্রতিম শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের

করকমলে—

হে গীত-সুন্দর! বিদেশিকার সুর-সভায় আমন্ত্রিত তোমায়—তোমার যাত্রাক্ষণে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। তুমি জয়যুক্ত হও।

ঐ বাজে তোমার যাত্রাপথের বিজয়-দুন্দুভি। কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় দুলিয়া উঠিল তোমার অরুণ-কেতন। দিগ্বিজয়ের মোহন সাজে জ্বলিয়া উঠিল তোমার ললাটে যৌবনের জয়টীকা। সাজো বন্ধু, আমরা তোমায় বরণ করি।

হে তরুণ তাপস! ঐ জাগে তোমার ধ্যানলোকের সুরলক্ষ্মী। ঊর্ম্মিমালায় বাজে তার মণি-মঞ্জীর। সপ্ত সিন্ধুর পার হতে আসে তার সংকেতের তরঙ্গ অঙ্গুলি। লহ বন্ধু আমাদের পুলক-পুষ্পাঞ্জলি।

সপ্তদ্বীপের দীপান্বিতার বরণ-মালা-গলে বিজয়ীর বেশে তুমি ফিরিয়া আসিবে, সেই আনন্দে আজিকার বিদায়গোধূলি হাসির রঙে রাঙিয়া উঠুক! হে সুর-কুমার, তোমার যাত্রাপথ সহজ হউক—শুভ্র হউক,—সুন্দর হউক।

তোমার গুণমুগ্ধ

**শুভানুধ্যায়ীবর্গ**

কলিকাতা

৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৩

## ( নিবেদন )

[ শ্রীদিলীপকুমার রায় ]

আপনাদের আমি আজ সামান্যই কিছু বল্‌ব— যদিও বক্তৃতাদি দেওয়া আমার প্রকৃতিগত নয়। আশৈশব গানই গেয়ে এসেছি—বলার অভ্যাস কখনও করি নি। এমন কি কেম্ব্রিজে নানা রকম য়ুনিয়ন প্রভৃতি কথা-বলার আখ্‌ড়ায়ও আমি কোনো মতেই বক্তৃতা করবার বা তর্কাদি করার প্রেরণা পাই নি। সময়ে সময়ে এজন্য দুঃখ যে হয় না তা নয়, বিশেষতঃ যখন দেখি সুভাষ, তুলসী প্রমুখ বন্ধুগণ এই রকম রিহার্সাল দিতে দিতেই চমৎকার বক্তা হয়ে দাঁড়ালেন আমার চোখের সামনে। অবশ্য ভুল বুঝবেন না আমাকে। আমার দুঃখ হ'ত এ জন্যে নয় যে, আমার কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রেছিলেন যে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার চেষ্টা আমি কোনোমতেই করতে পারি নি; আমার দুঃখ হয় এই জন্যে যে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার একটা চেষ্টাও আমি কেন করি নি। কারণ সে চেষ্টায় সাফল্য লাভ না করলে অন্ততঃ মনের কোণে এই সান্ত্বনাটিও ত' জাগ্‌ত যে, "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" কিন্তু তবু আমাকেও যে শিশুর মতন আধ আধ ভাষায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভঙ্গিমায় দায়ে-সারা গোছের ক'রে সভাসমিতিতে দু একটা বক্তৃতা কখনো কখনো দিতে হ'য়েছে তাকে ইংরাজীতে বলে Irony of fate. আজকে আমি এই নিষ্করুণ অদৃষ্টের এম্‌নিই একটা পরিহাসে প'ড়ে গেছি। এই কথাটি মনে রেখে আমার সদয় বন্ধু বান্ধব ও "দরদীবৃন্দ" আশা করি আমার এ অসহায় চেষ্টাতে মনে মনে আমাকে যতই দয়া করুন না কেন, অন্ততঃ প্রকাশ্যে হাস্‌বেন না।

প্রথমেই আজ যে আপনারা আমাকে প্রীতি দান ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে এ প্রকাশ্য সভায় এসেছেন তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ কৃতজ্ঞতা শুধু লৌকিকভাবে জ্ঞাপন করতে আজ উঠিনি। কারণ সে রকম লৌকিকতায় আমার মন সাড়া দেয় না, আমি পারি না। আমি আজ নিতান্তই ব্যক্তিগত দু'একটি কথা যথাসাধ্য স্ফুট ক'রে তোলার প্রয়াস পাব। যদিও মুখে আমার বক্তব্য প্রকাশ করা যে আমার পক্ষে কত কঠিন তা জানি আমি, জানেন আমার পরিহাস রসিক বন্ধুবান্ধব ও সুধীজন ও জানেন অন্তর্য্যামী। তবে আশা করি আজ কোনো মতে কষ্টেশ্রেষ্টে এ পরীক্ষা সাগরে উত্তীর্ণ হ'য়ে যাব, কেন না আজ আমি কেবল তেম্‌নি ধরনের দুচারটি কথা বল্‌তে উঠেছি যেমন ধরনের কথা আমার হৃদয় থেকে ঠেলে উঠ্‌ছে। তাই আশা হয়, বলার পথে বাধাকে একরকম ক'রে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারব— বিশেষতঃ যখন ব্যক্তিগত কথা বলার লোভটা মানুষের একটা ভয়ানক লোভ।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, আমার দুচারজন বন্ধু বান্ধব যখন আমাকে এই অভিনন্দন দিতে চেয়ে আমার কাছে এসেছিলেন, তখন দুরকম মনোভাবের আমার মনের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। প্রথম, আমার মধ্যেকার একটা স্বাভাবিক কুণ্ঠা ও দ্বিতীয়, সাধারণ্যকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পাওয়ার একটা স্বাভাবিক লোভ।

অনেকের হয় ত মনে হ'তে পারে যে, লোভটাই আমার ছিল বেশি—কুণ্ঠাটা যদি থাকেও ত নিশ্চয়ই ছিল —নিতান্তই পিছন দিকে। কেন না যে লোক সভায় সমিতিতে গত চার পাঁচবৎসর ধ'রে অবিরাম তারস্বরে চীৎকার ক'রে নিরীহ জনসাধারণকে অতিষ্ঠ করে এসেছে,

যে লোক শুধু বাংলা দেশে নয় প্রায় সমগ্র ভারতে নিরন্তর ভ্রাম্যমান হ'য়ে গানের সমালোচনায় অনেকের বিরোধিতাই অর্জ্জন ক'রেছে; যে লোক মাসিক পত্রিকাদিতে ধারাকারে নিজের লেখা প্রকাশ ক'রে নিজেকে জাহির ক'রেছে—তার সম্বর্দ্ধনা নেবার সময়ে কুণ্ঠা হওয়ার কথা নয় এই রকম সন্দেহই সাধারণের মনে উদয় হ'তে পারে। অন্ততঃ হওয়াটা অসঙ্গত নয়।

অসঙ্গত নয়, যেহেতু কথাটা আংশিকভাবে সত্য। তাই সত্যের মর্য্যাদা রাখ্‌তে হ'লে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, লেখা বলুন বা গান বলুন বা ভাব বলুন সবেরই প্রকাশে আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় যে, সমাজ সৃষ্ট হ'য়েছে এই জন্যে যে মানুষ প্রকাশেই সার্থক হ'য়ে ওঠে—শুধু একাকিত্বে নয়। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে ব'লেছিলেন যে, সহানুভূতির অভাবে যা'র মনে দুঃখ না হয়, সে হয় অতিমানুষ, না হয় মানুষই নয়—কথাটা খুবই সত্য। আমার বার বার মনে হয়েছে যে, যদি প্রত্যেকে সমাজে তার ঠিক্ স্থানটি খুঁজে পায় তা হলে সে নিজেকে বিলিয়ে দেবার চেষ্টায় সত্যিকার অহমিকার অভিযোগে পড়তেই পারে না। অহমিকা আসে তখনই যখন মানুষ তার সেবার স্থানকে বেশি বড় ক'রে দেখ্‌তে চায়, যখন সে মনে করে যে দেশের কাজে তার দান অমূল্য, যখন সে ভাবে যে, দেশ শুধু তার মুখ চেয়েই চ'লেছে, একেই ইংরেজীতে বলে ego-centric মনোভাব।

এই মনোভাবটি মানুষকে প্রীতির আলো থেকে বঞ্চিত করে—কেননা এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত প্রীতির উপর নয়, অবজ্ঞার উপর। সংসারে আমরা যা দেই তাই ফিরে আসে। সুতরাং অহমিকা অসমীচীন—যদি প্রীতি, সহানুভূতি, স্নেহ শ্রদ্ধা পাওয়াটা কাম্য ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়।

তাই যদি আমার সম্বন্ধে সাধারণের মনে হয় যে, আমি এ যাবৎ বরাবর নিজেকে জাহির করবার চেষ্টাই ক'রে এসেছি তাহ'লে আমি স্বীকার করব বটে যে, সে অভিযোগ মূলতঃ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু এ প্রবৃত্তিটির উদ্ভব কোনও অনুচিত মনোভাব থেকে নয়, এইটুকুই আমার সাফাই। কেন নয় একটু খুঁলে বলি। আমি বরাবর মনে ক'রে এসেছি যে, প্রত্যেকের নিজের যেটুকু সামান্য বল্‌বার আছে, সেটুকু তার ব'লে ফেলাই ভাল। কারণ তার মধ্যে সাময়িক যেটুকু, সেটুকু সাময়িকতার কাজ ক'রেই লীন হ'তে বাধ্য, অথচ এ আশঙ্কার ভয়ে নিজের মধ্যে যেটুকু সত্য সম্পদ থাকতে পারে অযথা বিনয়ে তার কণ্ঠরোধ করা অহমিকা প্রকাশ করার চেয়ে কম অসার নয়। কথাটা একটু খুলে বলি—যেহেতু ব্যক্তিগত কথা আজ বলবার একটা অবসর পাওয়া গেছে।

আসল কথা—বিনয়ের অত্যুক্তিকে আমি অতি হীন মনে করি ও সর্ব্বদা দীনতা প্রকাশকে মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে অগৌরবের বিষয় ব'লে অনুভব করি। একথা যেমন সত্য নয় যে, জগৎ আমার চার দিকেই পরিভ্রমণ করছে, তেম্‌নি একথাও সত্য নয় যে, সমাজে আমার কোনও স্থানই নেই—আমি সকলেরই দাসানুদাস, কীটানুকীট ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ ঐ যে বল্‌লাম, প্রত্যেকের জীবন-প্রশ্নপত্রে তাকে বিধাতৃ-পরীক্ষক যে প্রশ্নগুলি সমাধান করতে দিয়েছেন—তার মধ্যে একটি অত্যন্ত বড় প্রশ্ন এই যে, সমাজে তার স্থান কোথায়? সমাজে নিজের স্থানটি খুঁজে-পাওয়া জীবনে তাই একটা নিবিড় সার্থকতা আনেই আনে। অযথা দীনতার পরিপোষণে এ সত্যানুসন্ধানের অমর্য্যাদা হয়, আত্মবিকাশের কর্ত্তব্য সাধনে বিঘ্ন ঘটে, এক কথায় মনুষ্যত্বের দাবীদাওয়ার মর্য্যাদার অপমান করা হ'য়ে থাকে। পরমহংসদেব ব'লেছেন, "যে আপনাকে সদাই পাপী পাপী করে সে শেষকালে পাপীই হয়ে যায়।" কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তেম্‌নি যে সর্ব্বদা নিজেকে দীন হীন কীটানুকীট ভাবে, সে শেষে তাই হ'য়ে যায়। কাজেই এ রকম মনোভাব জাতীয় জীবনে চারিয়ে গেলে তাতে ক'রে না বাড়ে জাতীয় সম্পদ, না মুখোজ্জ্বল হয় মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের। মানুষ জীবনে বার বার উপলব্ধি ক'রেছে যে, সে বিশ্বে অমৃতেরই পুত্র, পাতালের দ্বারী মাত্র নয়।

মনে হচ্ছে হয়ত আমার একটু বেশি বলা হ'য়ে যাচ্ছে। কারুর কারুর মনে হ'তে পারে এত কথা বলাটা কি

শোভন? কিন্তু এর উত্তর ঐখানে যে, এতে কতটুকু যায় আসে—যদি সমাজে আমরা নিজের সাধ্যটুকু দিয়ে সমাজের স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসী হই! ছুটো কথার সমীচীনতা অসমীচীনতায় কতটুকু যায় আসে? তা সাময়িক। যেটা স্থায়ী তাই দিয়েই মানুষের বিচার হয় ও হওয়া উচিত। তাই আরও দুএকটা কথা বল্‌তে সাহসী হচ্ছি।

প্রথমতঃ বিলাতযাত্রা সম্পর্কে দুএকটি ব্যক্তিগত কথা বল্‌বার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাক্‌।

আপনারা অনেকেই আশা করেন, প্রতীচ্যে আমি আমাদের সঙ্গীত প্রচারের কাজে যাচ্ছি। এত বড় কাজের যোগ্য আমি সত্যই নই।

তাই দেশের কোনও মস্ত কাজে আমি যাচ্ছি একথা আমি সহজেই বল্‌তে পারি না ও কাজেই আমি আপনাদের কাছে কোনও সম্মান পেলে কুণ্ঠিত বোধ না ক'রেই পারি না।

আমি দাবী করতে পারি কেবল আপনাদের একটুখানি প্রীতি, একটুখানি সহানুভূতি, একটুখানি শুভ কামনা। তাঁর বেশি চাইলে সত্যই আমি অহমিকাই প্রকাশ করব। কেন না আমি সঙ্গীতজগতে কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পদ এ-অবধি দিতে পারি নি—সেটা আমার একটা উচ্চাশা মাত্র, যার পূরণ একটা জীবন-সাধনায়ই খানিকটা হ'তে পারে এবং আমার সাধনার এই সবে আরম্ভ।

তবু আমি একটা কথা আপনাদের বলতে চাই। সেটা এই যে, আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের পরিচয় ক'রে দেবার সময় আজ এসেছে ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে এবং সে-কাজটা একটা মস্ত কাজ। কথাটা একটু বিশদ ক'রে বলব।

অনেকে বলেন যে, আমাদের জাতির যখন এ-হেন দুর্দ্দিন তখন সঙ্গীতের মতন সৌখীন পণ্যের বাণিজ্য করতে যাওয়াটা বিড়ম্বনা মাত্র। কথাটা সত্য নয়, যদিও এক সময়ে আমার নিজেরই সত্য মনে হ'ত। সে-সময় আমি য়ুরোপে মহাপ্রাণ বারট্রাণ্ড রাসেল ও রোমাঁ রোলাঁকে আমার সমস্যার কথা জ্ঞাপন করি। তাতে একজন আমায় লিখেছিলেন যে, দেশের সেবার জন্যে যে নিজের কোনও গভীর প্রবণতার উচ্ছেদ করে তার দ্বারা দেশের কোনও সত্যিকার বড় সেবাই হয় না—সে হ'য়ে ওঠে কেবল একটা fanatic এবং fanatic সর্ব্বদেশেই হিতের চেয়ে অহিতই ক'রে থাকে বেশি। আর একজন আমাকে লিখেছিলেন যে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়া জগতের যতটা সত্য হিতসাধন করা যেতে পারে সে হিতসাধন সমাজের বা দেশের কোনও হিতের চেয়েই কম নয়।

কথাদুটি আমাকে যে কতখানি সত্য আলোক দিয়েছিল তা আপনাদের আমি হয়ত আজ বোঝাতে পারব না। কারণ আমি যতই সঙ্গীত চর্চায় আনন্দ লাভ ক'রেছি ততই দেখেছি যে, সমাজসেবার রূপ মাত্র একরকম নয়, তা বহুধা এবং ক্রমেই উপলব্ধি ক'রেছি যে, সমাজের সব চেয়ে সত্য সেবা হয় আত্মসেবায়।

কথাটা ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। আত্মসেবা বলতে আমি স্বার্থের গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণ ক'রে যে আপাতসুখ ভোগ করা যেতে পারে সেটা বুঝছি না;—আমি আত্মসেবা বলতে এখানে বুঝছি—নিজের শক্তি ও ক্ষমতার যথাসাধ্য স্ফুরণ করবার চেষ্টা। যার যে দিকে শক্তি সে সেই দিকেই শক্তির বিকাশে সমাজের সব চেয়ে সত্য সেবা করতে পারে। নইলে সকলকে একই ঘানিগাছে জুড়ে দিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে যতটা পারা যায় তেল আদায় ক'রে নেবার চেষ্টা করাটায় আর যাই হোক্‌ না কেন, দেশের দুর্দ্দশা মোচন হয় না। আমাদের সকলকে বিধাতা সৃষ্টিতে একই ছাঁচে যখন গড়েন নি, তখন জীবনে আমাদের একই পথে রওনা ক'রে দিলে তাতে কি দেশই অগ্রসর হবে, না মানুষই বড় হবে? রবীন্দ্রনাথকে প্লাটফর্ম্ম বক্তা বা জগদীশচন্দ্রকে মিলওয়ালা করলে তাতেই কি দেশের সত্য সম্পদ বেশি বাড়ত? আমাদের মতন অন্যান্য সকল মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক্‌ তাই।

একথা যদি সত্য হয় ও সঙ্গীতসেবা যদি একটা ভাল কাজ ব'লে আপনারা বিশ্বাস করেন কেবল তাহ'লেই আমি এ সাহসিক কথাটি আজ মুখ ফুটে বলতে প্রয়াসী হ'তে পারি যে, জাতির শত দৈন্য শত দুঃখ শত ব্যথারও ওজরে

কোন ললিতকলাকে অবজ্ঞার আওতায় বিবর্ণ হ'য়ে যেতে দেওয়া উচিত নয় বা সঙ্গীতের মতন ললিতকলায় আমাদের দানকে জগতের কাছে প্রকাশ করতে যাওয়াটা নিষ্প্রয়োজন মনে করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। এ কথাটা অহমিকার কথা নয়, আত্মপ্রত্যয়ের কথা, নিজের সত্য বিকাশে আস্থা স্থাপনের কথা,—সত্য মনুষ্যত্বের সম্পদে স্বর্গীয় বিশ্বাসের কথা। এ দৌত্য কার্য্যে আমি সফল হই বা না হই, আমাদের সঙ্গীতে আমি পারদর্শী হই বা না হই, সেটা অবান্তর জিনিষ। আসল কথা, আদর্শটি সত্য, না মিথ্যা। আমার বক্তব্য এই যে, আদর্শটি যদি ব্যক্তিগত দিক্ দিয়ে সত্য হয় তবে জাতির দিক্ দিয়েও তা সত্য হবেই হবে।

সাধারণ কথা থেকে এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করতে গেলে আমি বলতে চাই যে, য়ুরোপে আমাদের সঙ্গীতের আদর যে অদূর ভবিষ্যতে হবেই হবে এ সম্বন্ধে শুধু যে আমার নিজের বিশ্বাস দৃঢ় তাই নয়, এ ধারণার আমার ভিত্তিও যথেষ্ট আছে। সে কারণ দর্শানো বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, তাই একথা প্রমাণ করবার জন্যে উদাহরণবাহুল্যের আশ্রয় না নিয়ে আমি শুধু বল্‌তে চাই যে, এ সিদ্ধান্ত করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে, নিকট পরিচয়ে ওরা আমাদের সঙ্গীতের গরিমা বুঝবেই বুঝবে—যেমন আজ আমাদের কাব্যসম্পদ ও চিত্রকলার মহিমা স্বীকার ক'রেছে।

তা ছাড়া আমরাও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নিকট পরিচয়ে যথেষ্ট লাভ করতে পারি। অভিজ্ঞতার বিস্তারই দৃষ্টির প্রসারের সব চেয়ে বড় সহায়। সঙ্গীতকে যথাযথ perspective-এ দেখ্‌তে গেলে,তার আচারগত ও চিরন্তন মহিমাকে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে গেলে, এক কথায় সঙ্গীতের স্রোতস্বিনীধারাকে স্বল্পসলিলা সঙ্কীর্ণতার কবল হ'তে মুক্তি দিয়ে গতি উচ্ছল সাগরে নিবেদন করতে গেলে উদার অরুণালোক সম্পাতের পরশটি অমূল্য। জগতের সভ্যতার সম্পদ আজ অবধি এই আদান প্রদানেই সমৃদ্ধি লাভ ক'রে এসেছে। কূপমণ্ডুকতা ও গোঁড়ামির দিন গত। অরবিন্দ তাঁর Ideal of Human Unity নামক অপূর্ব্ব বইখানিতে তাঁর অনুপম গভীর দৃষ্টির আলোয় এই সত্যটিই বহুল যুক্তি ও দৃষ্টান্তে প্রমাণ ক'রেছেন যে, আজকের দিনে সব চেয়ে বড় যুগধর্ম্ম হচ্ছে মানুষের পরস্পরের কাছে আসা। এ কথাটা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহ'লে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের নিকট পরিচয় কলানুরাগীদের কাছে কাম্য বলে গণ্য হবেই হবে।

অবশ্য এ পরিচয় সত্য হ'তে দিন নেবে। কোনও বড় অভিজ্ঞতাই একদিনে উপলব্ধ হয় না, দিনে দিনে তিলে তিলে আমাদের অণুপরমাণুতে মিশে আমাদের অঙ্গীভূত হয়। কাজেই এ পরিচয়ের থেকে লাভটা একদিনেই আমাদের প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠ্‌বে এ আশা যেন কেউ না করেন। তাই আমার বক্তব্য শুধু এই টুকুমাত্র যে, ফল মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ না হ'লেই যেন আমরা সিদ্ধান্ত ক'রে না বসি যে ফসল ফল্‌ল না। গীতায় বড় সত্য কথা লিখেছে যে,—

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরঃ ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।

অর্থাৎ সংশয়ীর না আছে সুখ, না আছে শান্তি না আছে ইহলোক না পরলোক।

আপনাদের আর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করা যদিও সাধুজনসম্মত, তবু বেশি অত্যাচার করলে টলে না এমন ধৈর্য্য ত দেখা যায় না। অতএব আজ এখানেই সমাপ্তি টানি। যদি ব্যক্তিগত ভূমিকার ভণিতায় এমন কিছু বলে থাকি যা আমার পক্ষে ঠিক্ সুষ্ঠু হয় নি তাহ'লে শুধু প্রবীণদের কাছে আমার ক্ষমা চওয়ার দরকার আছে। কারণ নবীনদের কাছে নবীনের সাত খুন মাফ।

আপনারা আমাকে আজ যে প্রীতিদান ক'রেছেন তা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্—বিশেষত যখন এ রকম প্রকাশ্য অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্যতা আমি অর্জ্জন ক'রেছি ব'লে কোনোমতেই মনে করতে পারি না। তবে প্রীতির ধর্ম্মই এই যে, সে দানের ক্ষেত্রে যোগ্য অযোগ্য বিচার করে চলে না; যেহেতু প্রীতি—বিচারপতির রায় নয় যে, আগে প্রমাণপ্রয়োগ না হ'লে তার গতির পায়ে শৃঙ্খল

পড়বেই পড়বে। প্রীতি-সহানুভূতির সার্থকতা—দানে; দেওয়াতেই সে স্বয়ংসিদ্ধ, কারণ দিয়ে সে একদিকে যেমন দানের গৌরব বাড়ায়, অপর দিকে তেম্‌নি যে দান লাভে ধন্য হয় তাকেও বড় ক'রে থাকে। সেই জন্যেই আমি আপনাদের অভিনন্দন আজ সাদরে শিরে ধারণ করতে রাজি হ'য়েছি, যেহেতু আমাদের সম্বন্ধে অপরের আশা ও দাবী আমাদের নিহিত শক্তিকে সজাগ করে। অপরে আমাদের কাছে কি চায়, সমাজ আমাদের কাছে কি আশা করে, মানুষ আমাদের কাছে কি ভরসা রাখে, তার ওপর আমাদের আত্মোৎকর্ষ ও আত্মোপলব্ধির বড় কম নির্ভর করে না; এবং অপরের এই দাবী ও প্রত্যাশার কর্ষণেই আমরা আমাদের নিহিত শক্তিরাশির বীজগুলিকে বিকশিত ও মুঞ্জরিত ক'রে তুল্‌বার প্রেরণা পেয়ে থাকি। মানুষে মানুষে সম্বন্ধের মধ্যে যে চিরন্তন ঐক্যের বাণীটি সৃষ্টির আদিম কাল থেকে উপ্ত তার পরম মহিমাই যে এইখানে।

---

# বিধি-লিপি

( সংস্কৃত হইতে )

শ্রীসারদাচরণ রায়

বাঁশঝাড় বলে উঠে "কোথা বসন্ত !'
বরষ অন্ত ;—আমি যে ক্লান্ত—
তবু নাহি দেখা তার।"
উলূক ডাকিছে 'মুখখানি করি ভার
"কোথায় আলো, কোথায় তপন ?
নাহি যে সূর্য্য, সত্য এ কথন।"
চাতকিনী গাহিছে সদা "ফটিক্-জল্
কোথা বারি, জীবন বিফল !
চেয়ে আছি নিতি আন্‌মন্।''
আকাশের বাণী বলে "বৃথা এ ক্রন্দন !
অকারণ কেন দ্বন্দ !
যা হবার তা হচ্ছে জানিস্
তোর যে কপাল মন্দ।"

---

# দরদী

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

I ণ্‌া | ণ্‌া সা ণ্‌দ্রা প্‌ম্রা | া প্‌া ণ্‌া ণ্‌া | ণ্‌া সা সা -া | -া সা মা মা |
আ মা - রে - - চো খ ই সা - রা য় - ডা ক দি
খু লে - দা ও - র ঙ্ ম হ - লা র - তি - মির

জ্ঞা মা জ্ঞঋা সণ্‌া | া সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা সা | সা -া -া II
লে - হা য় - কে - গো দ - র - দী - -
দু - য়া র - ডা - কি লে - য - দি - - II II

সা | সা ঋা ণসা -া | া মা -া মা | পা মা জ্ঞরা জ্ঞা | -া দা দা পা |
গো প - নে - - চৈ - তী হা ও য়া য় - গু ল্ বা
পা ঠা - লে - - ঘূ - র্ণী দূ - তী - - ঝ ড় ক
তো মা - রি - - অ - শ্রু জ - লে - - শি উ লি
প উ - ষে র - এ ক লা বা - টে - - শূ - ন্য
ভি ড়ে - যা - - ভো র বা তা - সে - - ফু ল স্থ

পা মা জ্ঞঋা সা | ্য সা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা সা | সা -া -া
গি - চা য় - পা - ঠা লে - লি - পি - -
পো - তী - - বৈ - শা খে - স - খি - -
ত - লে - - সি - ক্ত শ - র - তে - -
মা - ঠে - - চা ই বি র - হি - ণী - -
বা - সে - - রে - ভো ম র ক - বি - -

ণ্‌া | ণ্‌া সা ণ্‌দা প্‌ম্া | ্য প্‌া ণ্‌া ণ্‌া | ণ্‌া সা সা -া | -া সা মা মা |
দে খে - তা ই - ডা ক্‌ ছে ডা - লে - - কু - কু
ব র - যা য় - সে ই ভ র - সা য় - মো র পা
হি মা - নী র - প - রশ বু - লা ও - ঘু ম ভে
উ ষ - সী র - শি স্‌ ম হ - লে - - আ স্‌ তে

জ্ঞা মা জ্ঞঋ সণ্‌া | -া ণা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা সা | সা -া -া II II
ব - লে - - কো য়ে লা ন - ন - দী - -
নে - চা য় - জ ল ভ রা - ন - দী -
ঙে - দা ও - দ্বা র য্‌ দি - রো - ধি - -
য - দি - - চা স্‌ নি র - ব - ধি - -

# দক্ষিণা

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

প্রিয়ার গালেতে চুমো খেয়ে যায় চকিতে পিয়াল রেণু!—
এল দক্ষিণা,— কাননের বীণা,—বনানী পথের বেণু!
তাই মৃগী আজ মৃগের চোখেতে বুলায়ে নিতেছে আঁখি,
বনের কিনারে কপোত আজিকে নেয় কপোতীরে ডাকি'!
ঘুঘুর পাখায় ঘুমুর বাজায় আজিকে আকাশখানা,—
আজ দখিনার ফর্দ্ধা হাওয়ায় পর্দ্দা মানে না মানা!
শিশির শীর্ণা বালার কপোলে কুহেলীর কালো জাল
উষ্ণ চুমোর আঘাতে হ'য়েছে ডালিমের মত লাল!
দাড়িমের বীজ ফাটিয়া পড়িছে অধরের চারিপাশে
আজ মাধবীর প্রথম উষায়,—দখিনা হাওয়ার শ্বাসে!

মদের পেয়ালা শুকায়ে গেছিল,—উড়ে গিয়েছিল মাছি,
দখিনাপরশে ভরা পেয়ালায় বুদ্বুদ্ ওঠে নাচি'!
বেয়ালার সুরে বাজিয়া উঠিছে শিরা উপশিরাগুলি!
শ্মশানের পথে করোটি হাসিছে,—হেসে' খুন্ হোল খুলি!
এস্রাজ বাজে আজ মলয়ের,—চিতার রৌদ্রাতপ
সুরের সুঠামে নিভে যায় যেন,—হেসে ওঠে যেন শব!
নিভে যায় রাঙা অঙ্গারমালা,—বৈতরণীর জলে
সুর-জাহ্নবী ফুটে ওঠে আজ মলয়ের কোলাহলে!
আকাশ-শিথানে মধু-পরিণয়,—মিলন-বাসর পাতি'
হিমানীশীর্ণ বিধবা তারারা জলে' ওঠে রাতারাতি!
ফাগুয়ার রাগে চাঁদের কপোল চকিতে হ'য়েছে রাঙা!
—হিমের ঘোম্‌টা চিরে দেয় কে গো, মরমস্নায়ুতে দাঙা!
লালসে তাহার আজ নীলিমার আনন রুধির-লাল,—
নিখিলের গালে গাল পাতে কার কুঙ্কুম-ভাঙা গাল!
নারাঙ্গি-ফাটা অধর কাহার আকাশ বাতাসে ঝরে!
কাহার বাঁশীটি খুন উথলায়,—পরাণ উদাস করে!
কাহার পানেতে ছুটিছে উধাও শিশুপিয়ালের শাখা!
ঠোঁটে ঠোঁঠ ডলে—পরাগ চোঁয়ায় অশোকফুলের ঝাঁকা!
কাহার পরশে পলাশ-বধূর আঁখির কেশরগুলি
মুদে' মুদে' আসে,—আরবার করে কুঁদে কুঁদে কোলাকুলি
পাতার বাজারে বাজে হুল্লোড়,—পায়েলার রুণ্ রুণ্,
কিশলয়দের ডাশা পেযে কে গো—চোখ করে ঘুম-ঘুম!

এসেছে দখিনা-ক্ষীরের মাঝারে লুকায়ে কোন্ এক
হীরের ছুরি!—
তার লাগি তবু ক্ষ্যাপা শাল নিম তমাল বকুলে হুড়াহুড়ি!
আমের কুঁড়িতে বাউল বোল্‌তা খুন্‌সুড়ি দিয়ে খসে যায়,—
অঘ্রাণে যার ঘ্রাণ পেয়েছিল,—পেয়েছিল যারে 'পোষলা'য়,
সাতাশে মাঘের বাতাসে তাহার দর বেড়ে গেছে দশগুণ,—
নিছক হাওয়ায় ঝরিয়া পড়িছে আজ মউলের কস্'গুণ্!
ঠেলে ফেলে দিয়ে নীলমাছি আর প্রজাপতিদের ভিড়
দখিনার মুখে রসের বাগান বিকায়ে দিতেছে ক্ষীর!
এসেছে নাগর,—যামিনীর আজ জাগর রঙীন আঁখি,—
কুয়াশার দিনে কাঁচুলি বাঁধিয়া কুচ্ রেখেছিল ঢাকি',
আজিকে কাঞ্চী যেতেছে খুলিয়া,—মদঘূর্ণনে হায়!
নিশীথের স্বেদ-সীধুধারা আজ ক্ষরিছে দক্ষিণায়!
রূপসী ধরণী বাসকসজ্জা,—রূপালি চাঁদের তলে
বালুর ফরাশে রাঙা উল্লাসে ঢেউয়ের আগুন জলে!
রোল উতরোল শোণিতে শিরায়,—হোরীর
হা রা রা চীৎকার,—
মুখে মুখে মধু,—সুধাসীধু শুধু,—তিত্ কোথা
আজ তিত্ কার!
শীতের বাস্তভিত্ ভেঙে' আজ এল দক্ষিণা,—মিষ্টি-মধু,
মদনের হুলে ঢুলে ঢুলে ঢুলে হুঁশ্-হারা হোল সৃষ্টি-বধূ!

# বিনোদিনীর ব্রজ

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

গোঁসাইগোবিন্দপুরের রায়ত-হিতৈষিণী সভার কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিতেছিলাম; সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী বিনোদিনী। বিনোদিনীকেও রায়তোদ্ধারক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছিলাম।

সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বতোভাবে অধিকারচ্যুত রায়তের কষ্টে প্রাণ যাঁদের কাঁদে বলিয়া প্রসিদ্ধি আমি তাঁহাদেরই একজন—তবে ক্ষুদ্র। কাঁদি বলিয়াই যে আমি ঠিক্ ভাবিয়া কাঁদি ইহা কেহ মনে করিবেন না। শ্রেষ্ঠতর ভাবুকগণের ভাবধারার সঙ্গে আমি এমনই ওতপ্রোত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া গিয়াছি যে আমারই মনে হয়, আমি যাহা বলি তাহা আমার নিজস্ব চিন্তারই ফল, জানিতে আমার কিছু বাকি নাই। স্ত্রী বিনোদিনীও সেই রকমই মনে করেন।

—স্বরাজ আমরা চাই-ই; আমি ভাবিতাম, আমরাই বুঝি চাই; বিনোদিনীকেও বুঝাইয়াছিলাম যে, আমরাই স্বরাজ চাই। এই আশ্চর্য্য অযৌক্তিক ও ভুল ধারণাটা সস্ত্রীক জীবনের দিনান্ত পর্য্যন্তই টানিতে হইত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির কথায় আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া গেল, তিনি বলিলেন,—স্বরাজ আমরা পেতে চাই, কিন্তু আমরা মানে কি? প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার মুখের দিকে একাগ্রচিত্তে চাহিয়া রহিলেন। আমার অভিজ্ঞতার চতুঃসীমার মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তরের উদ্দেশও ছিল না; কাজেই সুবিবেচক কাজের লোক বলিয়া যে খ্যাতিটা নিরতিশয় তৃপ্তির সহিত এতদিন উপভোগ করিয়া আসিতেছি; মনে মনে ও ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করিলাম, প্রশ্নটি সোজা যাইয়া তাহারই মূলে যেন ঘা দিল, কিন্তু ব-কলমে বড় বড় যত কাজই চলুক, তাহার দ্বারা জেরার মুখ আট্‌কান যায় না। পাঠশালা হইলে আহম্মকির দরুণ ঠিক্ চড় খাইতাম, কিন্তু ভদ্রলোক সেদিক দিয়া না যাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—আমরা মানে তারাই যারা উঠ্‌তে বস্‌তে জুতো খায়, নিজেরই ভিটে মাটি নিজের বল্‌বার অধিকার যাদের নেই, তেষ্টার জলের জন্যে কূঁয়ো পুষ্করিণী খোঁড়বার এক্তিয়ার যাদের নেই, গাছ লাগিয়ে ফল ভোগ কর্‌বার সামর্থ্য যাদের নেই, নিজেরই জমি ইচ্ছেমত হাতছাড়া কর্‌বার অধিকার যাদের নেই, যারা সমাজের অন্ন আহরণের হস্ত, আমরা মানে তারাই। যে স্বরাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধে করে' দেবে সে স্বরাজ আমরা চাইনে। আর আমরা কি চাই?—

প্রশ্নটি করিয়া তিনি আর উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন,—চাই মাম্‌লাবাজ, মেয়েমানুষখোর, মোটরবাহন, মদ্যপ আর মিথ্যার জাহাজ যে শ্রেণী এ দেশের কলঙ্ক, চাই সেই জমিদারের শিকড় পর্য্যন্ত ধ্বংস ক'রতে, তাদের ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত স্বরাজ চাওয়া আমাদের পক্ষে বাতুলতা। বলিতে বলিতে বক্তার দৃষ্টি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।...

বাবুটি মোটরে উঠিয়া প্রস্থান করিলে বিনোদিনীকে ডাকিয়া তাঁহারও ভুল ভাঙ্গিয়া দিলাম। বলিলাম,—বিনোদ, এতদিন আমরা ভুল চিন্তা করে' ভুল পথে

চলছিলাম। স্বরাজ আমরা চাই বটে, কিন্তু আমরা মানে ত' আমরা নয়; আমরা মানে তারা—ইত্যাদি। বিনোদিনী কথা বোঝেন ভাল, আমার বক্তব্য বেশ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু স্বরাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে কতকগুলি লোকের শিকড় তুলিয়া ফেলিবার প্রস্তাবে তিনি একচমক্ কাঁদিয়া উঠিলেন বলিয়া আমার সন্দেহ হইল।...

গোঁসাইগোবিন্দপুরে হাটের উপর পিঠ্ভাঙ্গা চৌকিতে বসিয়া জমিদারের শিকড় উপ্ড়াইবার কাজে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ষ্টেশনে আসিলাম। ছোট্ট ষ্টেশনটি, লোক-জন কম, মালপত্র আরও কম। গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে যা' একটু সজীবতা দেখা দেয়, বাকি সময়টা সে ঝিমাইয়া কাটায়।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; সস্ত্রীক গাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেলাম।

গান্ধীজীর দেখাদেখি আমিও তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলাম। অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে যাহারা বেড়ায় তাহারাই ত' দেশের মেরুদণ্ড, দেশের লক্ষ্মী, দেশের ভরসা, দেশের শক্তি, দেশের শির; রেলের খরচ তাহারাই টানে, মাঝখানের সর্ব্বপ্রকারের ব্যবধান ভেদচিহ্ন অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া না গেলে যে স্বরাজের ভিত্তিই প্রস্তুত হইবে না। ফাঁকে ফাঁকে থাকিয়া তাহাদিগকে সংহত সচল করিয়া তুলিবার আশা যাঁহারা করেন তাঁহারা ভয়ানক ভুল করেন; তাহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভিতরকার শক্তিকে চালিত করত জমিদারের শিকড় তুলিয়া ফেলিয়া স্বরাজ পাইতে হইবে—ইহা আমারও বদ্ধমূল বিশ্বাস। এতকাল নিজেই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছি, এবার সঙ্গে লইলাম স্ত্রী বিনোদিনীকে। নারীকে আড়াল করিয়া রাখিয়া তাহার মনুষ্যত্বের যথেষ্ট অমর্য্যাদা করা হইয়াছে। আর কেন?

—একটা কাম্রায় আরোহীসংখ্যা কম ছিল, দেখিয়া শুনিয়া সেইটাতেই উঠিয়া পড়িলাম। আমিও উঠিলাম, গাড়ীও পোঁ করিয়া ছাড়িয়া দিল। দরজা বন্ধ করিয়া চাহিয়া দেখিলাম—প্রকাণ্ড কাম্রাটী; লেখা আছে, "৮০ জন বসিবেক।" ফাঁকে ফাঁকে ছড়াইয়া ছড়াইয়া বসিয়া আছে প্রায় তিরিশটি লোক; সকলেই চির-অবহেলিত সেই কৃষক ও শ্রমিক-সমাজের হিন্দু ও মুসলমান; স্বরাজ-যজ্ঞের যজ্ঞপতি।

সুবিধায় বসিবার মত একটা স্থানের খোঁজে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদিনীর উদ্দেশে বলিলাম,—এস। বলিয়া বিনোদিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়াই আমি বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম।

বিনোদিনীর বয়স এখন বত্রিশ; খুঁজিলে তাঁহার মাথায় দুটো একটা পাক্য চুল না পাওয়া যায় এমন নয়; কিন্তু তাঁর যৌবনশ্রী ষোল বৎসর পূর্ব্বে যেমনটি দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে এখনও ঠিক তেমনটিই আছে, অস্তগিরির ছায়াপাতে তাহার নবীনতা ম্লান হইয়া ওঠে নাই। পাকা চুলের বৃত্তান্তটা বাহিরের লোক অনবগত, সে খবরটা কেবল আমিই জানি; কিন্তু তাঁর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য, আর দেহের গঠনসুষমা যে কত, তাহা চোখ দিয়া যে দেখিতে জানে তাহারই চোখে পড়িবে।...

দেখিলাম, তাঁর মুখখানি আনত, আর তাঁর সেই অপরূপ অক্ষুণ্ণ যৌবনমাধুরীর উপর বালারুণের লোহিতচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিবার মত জিনিষ বটে, আমার ভুলে যাওয়া অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। এখন বিনোদিনী শুধু বিনোদিনী, সংক্ষেপে বিনোদ—এইমাত্র। এইটুকুই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁর সর্ব্বাঙ্গের রেখায় রেখায় যৌবনরাণী যে প্রজ্বলিত সমারোহ একদা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা একেবারে থামাইয়া তিনি যে দীপ নিবাইয়া চিরদিনের মত চলিয়া যান্ নাই এ কথাটি আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ষোল বছর আগে প্রথম বয়সে মাঝে মাঝে বিনোদিনীর এই রূপ আমার চোখে পড়িত। সেই স্বপ্নের দিনগুলি আজ অকস্মাৎ আমার চোখের সাম্নে শ্রেণীবদ্ধা পুষ্পাভরণা রূপসীর মত সাজিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কারণটা কি? কোন্ মায়াবী এই রূপের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিল? মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, গাড়ীর মধ্যে চোখের স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে, সেই স্বরাজ্য পররাজ্য লুণ্ঠন

করিতেছে। এই লুণ্ঠনের হাঙ্গামাই নিঃশব্দে রক্তপাতাকা উড়াইয়া দিয়াছে, মানুষের রূপপিপাসা পাষাণস্তূপে রূপান্তরিত হইয়া যাক্ এ অনুচিত আকাঙ্ক্ষা আমার কোনোদিনই নাই ; কিন্তু সেই পিপাসাটা যে এমন উগ্র প্রগল্ভ মূর্ত্তিতে সস্ত্রীক আমার সম্মুখে একেবারে অকস্মাৎ হাঁ করিয়া খাড়া হইয়া উঠিবে তাহার জন্যও আমি কদাচ প্রস্তুত ছিলাম না। ... হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া বিনোদিনী অচল হইয়া গিয়াছিলেন, আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম।

—এস। বলিয়া পুনরায় আমি আরোহীবৃন্দের দিকে ফিরিতেই পাঁচ সাত জোড়া চোখ বাদে অবশিষ্ট চোখগুলি অন্যান্য দিকে ঘুরিয়া গেল।—কোনো জোড়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল, কোনো জোড়া নীচের দিকে ঝুঁকিল, কোনো জোড়া ছাতের দিকে উঠিয়া গেল, কোনো জোড়া পাশের দিকে ফিরিল, ইত্যাদি।

অগ্রসর হইয়া আসিলাম। ইচ্ছা ছিল, ঐ দিক্কার ঐ স্থানটিতে যাইয়া বসিব ; সেই স্থানটিতে বেঞ্চির উপর ধূলা দিয়া পায়ের মাপ কেহ রাখিয়া যায় নাই ; আশে-পাশেও পোড়া বিড়ি, পানের পিক্ আর দোনা, চূণের বোঁটা, থুথু আর থক্থকে গয়ের অনেক কম। সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে ঐ পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি লইয়া স্থান না বাছিয়া যেখানে সেখানে বসিয়া পড়াই আমার উচিত ছিল—পলিটিক্যালি ; কিন্তু অতটা সহসা সাহসে কুলাইল না।

কিন্তু সোজাপথে সেই স্বাস্থ্যকর স্থানটিতে যাইতে সম্মুখেই বাধা পাইলাম।—

একটি লোক তার সম্মুখের বেঞ্চির উপর পা তুলিয়া দিয়া হাপুস্ হাপুস্ বিড়ি টানিতে টানিতে দূর হইতেই হাঁ করিয়া বিনোদিনীর মুখপদ্মের মধুপান করিতে ছিল ; আমি তাহার কাছাকাছি আসিতেই সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। ইচ্ছা করিতেছে, লোকটার চেহারার একটা বর্ণনা এখানে দিই ; কিন্তু দিলাম না, কারণ সেই দিন সকাল বেলায়ই সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, জনৈক সংবাদদাতা সিরাজগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন,—"সিরাজগঞ্জের নাপিত সম্প্রদায় মোছলমানের ক্ষৌরকার্য্য করিবে না স্থির করিয়াছে। তাহারা সোজাসোজি ভাবে ধর্ম্মঘট না করিয়া বলিতেছে, তাহারা মোছলমানের হাতপায়ের 'চাড়া' কাটিবে না, কর্ত্তিত চুল ফেলিয়া দিবে না।" সংবাদটি পড়িয়া আমি শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। . . .

ফেণী, মগ্রাহাট, টাঙ্গাইল, নাটোর প্রভৃতি মফঃ-স্বলের অনেক স্থান হইতে গোলের ভয়াবহ যে আওয়াজটা আসিতেছে তাহাই স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে নম্রকণ্ঠে অনুনয় করিলাম,—পা যদি গুটিয়ে নিতে ভাই, তবে আমরা ওদিকে গিয়ে বস্তাম।

অনুনয়টি, আমাকে দাঁড়াইয়া দুবার করিতে হইল, প্রথমবার সে শুনিতেই পায় নাই। দ্বিতীয়বার অনুনয় করিবার পর সে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—ঐটে ডিঙ্গায়ে ঐদিক দিয়ে যাও। বলিয়া সে দুই বেঞ্চির মধ্যবর্ত্তী কাঠের বেড়াটা বাঁ হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

প্রতিবাদ করা আমার স্বভাব নয়, বিশেষত সিরাজ-গঞ্জের নাপিতগণ প্রকারান্তরে ধর্ম্মঘট করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে ; এই দুই কারণে আমার সঙ্গীটির নির্দ্দেশ মত বেঞ্চির উপর উঠিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া আর এক বেঞ্চিতে পৌছিলাম ; সেখান হইতে নামিয়া ফটক ঘুরিয়া ঢেঁকিশালায়, অর্থাৎ যে জায়গায় আসিতে চাই সেখানে আসিলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে চড়াই উৎরাই করিতে করিতে বিনোদিনীও আসিলেন, ইহা বলা অবশ্য বাহুল্য।

গাড়ী গুর্ গুর্ শব্দে চলিতে লাগিল।

আমাদের সাম্নেই দু'ব্যক্তি সোজা সাম্নের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল ; মিনিট পাঁচেক পরে তাহারা গলা মিলাইয়া গান আরম্ভ করিল—

সজনি লো আয় লো বুকে,<br>
আয় লো মিলাই মুখে মুখে,<br>
আয় লো ত্বরা,<br>
সারারাত থাক্বি বুকে<br>
তবে ত' রাত কাটবে সুখে<br>
বক্ষো ভরা।

মিলিতকণ্ঠের ঐক্যতান গাড়ী পূর্ণ করিয়া ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল; মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় লীলায়িত বহুভঙ্গিম্ স্বরস্রোত বহিতে লাগিল; কণ্ঠসঙ্গীতহিসাবে এই গান অনবদ্য—সঙ্গীতের আবেদনে কপটতা বা কার্পণ্য কিছুমাত্র নাই; শুনিয়া তৃপ্ত হইবারই কথা; কিন্তু ঐ সজনীটা কে? দিবাভাগে লোকপূর্ণ চলন্ত গাড়ীতে বসিয়া তাহাকে বক্ষলগ্ন হইতে আহ্বান করিবার সার্থকতাই বা কি?

যেন মহা অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেছি এমনি ভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, দু' একজন ছাড়া সকলেরই মুখে মৃদু মৃদু হাসি। বুঝিতে বাকি রহিল না যে রসজ্ঞ শ্রোতারা দিব্যসুখে সঙ্গীত উপভোগ করিতেছে; এই অতুলনীয় সঙ্গীতরস উপভোগে বঞ্চিত রহিলাম কেবল আমি; কেবল আমারই সুখের স্বাদ তিক্ত হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী বোধ করি মনে মনে বসুন্ধরাকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, মা, তুমি দু'ভাগ হও। তাঁহার মনের তখনকার প্রার্থনা যাহাই হউক, চাহিয়া দেখিলাম, কয়লার কুচি পড়ায় আঁচল তুলিয়া তিনি প্রাণপণে চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছেন।

সজনীকে ডাকাডাকি সমভাবে চলিতে লাগিল; কখনো যে এই আর্ত্তনাদের শেষ হইবে এ ভরসাও আমার রহিল না।

সজনী যিনিই হউন, তিনি যে ভক্তের ডাকের ভাষা বা উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই এরূপ মনে করিবার কারণ নাই; ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, যুক্তাক্ষরবিবর্জ্জিত; অর্থও পরিষ্কার; তাহার উপর এই বিরহীযুগল তাহাদের চক্ষুর ভাষাকেও ভুল বুঝিবার উপায়ই রাখে নাই। তবু সজনী নির্ব্বিকার!

মনে মনে গীতরচয়িতার সুসঙ্গত লিপিকুশলতার তারিফ্ করিতে করিতে একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিয়া ফেলিলাম, নাম টাম একটা কিছু গাও ভাই, এ গান থাক্—

দুইজনেই এক সঙ্গে গান থামাইয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, কেন, এ গানে হ'ল কি?

বলিলাম, গান্টা তেমন ভাল নয় বলেই মনে হ'চ্ছে।

—বেশ গান। বলিয়া একজন আর একজনের গা টিপিয়া দিল।

তারপর সশব্দে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া এবং শ্লেষ্মার স্তূপ আমারই সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা ভাঙ্গা রস জোড়া লাগাইয়া গাহিতে লাগিল,—

যত সুধা তোর অধরে
পিয়ারি সই আদর করে',......

শুনিতে শুনিতে হঠাৎ আমার নিজেকে বড় অসহায় মনে হইল। মনে হইল যেন অবলম্বনহীন ধূ ধূ অনন্ত শূন্যের ঠিক মাঝখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, কোথাও কুণ্ঠার বিঘ্ন নাই, লজ্জার আবরণ নাই, সংযমের গণ্ডী নাই; নিম্নে উলঙ্গ কুৎসিৎ পৃথিবী যেন দিবালোকে দ্বিধাহীন নিরবরুদ্ধ আসঙ্গে মাতিয়াছে। অসহ্য ঘৃণায় আমার গা বমি বমি করিতে লাগিল।

গাড়ী থামিল; নামিয়া মধ্যমশ্রেণীতে যাইয়া উঠিলাম।

বিনোদিনী সেই তারিখে সেই যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন স্বরাজ্যের লোভ তাঁহাকে আর টানিয়া বাহিরে আনিতে পারে নাই।

# লীলা-অভিলাষ

আব্‌দুল কাদের

যৌবনের প্রান্তে, তবু অন্তরের কম্পিত কিরণে
হবে না বিম্বিত বন্ধু মোর পাতে অভিমত্ত মনে !
হে মানী সন্ন্যাসী !
অন্ধ আস্তরন আঁকি
সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্য ঢাকি'
দৃষ্টির আড়ালে আজো যাবে দূর দূরান্তে উদ্ভাসি' ?
দীর্ঘ রাত্রি-যাত্রা মম ব্যর্থ করি তোমার প্রভাত
চিত্তে মোর আপনারে দীপ্ত সুখে না করি সম্পাত
যাবে অকস্মাৎ ?

বিনিন্দিত পিক-কণ্ঠে কাঁপি' যবে বিটপ-বাতাস—
হেমন্তের অন্তে' আসি' খুলি' দেবে দিগন্ত আকাশ
রূপের ভাণ্ডার ;—
সুপ্তিরে সে দিন টুটি'
আপনারে দেবো ছুটী,
পালঙ্কেতে এতকাল তার আশে ছিনু নির্ব্বিকার !
ফুল-গন্ধে যবে আজ বসন্তের বল্লরী বীথিকা
জলি' ওঠে তব মন্ত্রে—হেরি তাই স্তিমিত এ শিখা
নিরুদ্ধ গীতিকা ?

পুষ্প-রেণু হাতে করি' সুন্দর ফিরিছে দ্বারে দ্বারে
বিশ্ব-ভালে আঁকি দেবে বরণের সুরভি-আসারে
জয় জয়-টীকা।
শুব্ধ বায়ু তাই জাগি' ;—
পরাগ-সংঘাত লাগি'
কুঞ্চি' ওঠে হিমানীর সঙ্কুচিত পীত ললাটিকা !
ঘুমন্ত পরীরা জাগি' বাসন্তীর সুগন্ধ নিশ্বাসে
ইন্দ্র-ধনু-সেতু বাহি' নৃত্যে নৃত্যে মর্ত্ত্যে নেমে আসে
লীলা-অভিলাষে !

সমস্ত প্রাঙ্গন ঘিরি দাঁড়ায়েছে চঞ্চলের দল,
সবুজে ঢলিয়া পড়ে বিচিত্রার সুনীল অঞ্চল
সুন্দরের গানে !
তারি সুর বার বার
আমার আবদ্ধ দ্বার
ভগ্ন করি' চায় দিতে নগ্নতার নিস্ফল আহ্বানে !
বুঝি তার দূত আসি' ফিরে গেছে অকৃতার্থ মন
রুদ্ধ দ্বার হেরি'—মোর তাই সেথা' নাই নিমন্ত্রন
পত্র-সম্ভাষণ !

দুঃসহ আক্রোশে সেই আপনারে টুটিবারে চাই
সুন্দরের অপমানে,—যত দূরে দিগন্তে তাকাই
ফিরে আসে আঁখি !
কোন্ দুর্ব্বাসার শাপে
চিত্ত চির-নিশা যাপে ?
অনন্তের তীর লাগি' ফিরে মোর সান্ত শ্রান্ত পাখী ?
মৃত্তি শুধু মাখি হাতে, কোথা' রূপ, খুঁজি দিবা যামী
পলাশ ছিঁড়িয়া দেখি কোথা আছে সৌন্দর্য্যের স্বামী !
ব্যর্থ ভ্রষ্ট আমি।

বর্ষে বর্ষে প্রত্যাখ্যাত ওগো মোর অনাদৃত দেব !
আজো কি তোমার শোভে মোরে ত্যাজি দূরে কালক্ষেপ
ক্ষুদ্র অভিমানে ?
অঙ্গন ভরিয়া মোর
লেগেছে বর্ণের ঘোর,
যৌবনের সিন্ধু-প্রান্তে লুপ্ত আমি আপনার ঘ্রাণে।
বিদ্যুতের দৌত্যে জাগি' ক্ষমা চাহি খুলিয়াছি দ্বার
উচ্ছ্বসিয়া ডাকিয়াছি—উদ্বেলিত যৌবন-সম্ভার
লহ উপচার !

জাগো জাগো ক্ষমো আজ ওগো রুষ্ট সুন্দর সন্ন্যাসী !
অতন্দ্র অন্তরে জ্বাল তব স্নিগ্ধ অনিন্দিত হাসি
অগ্নি অনির্ব্বান !
রক্তাম্বর দাও পরি'
চক্ষু-বন্ধ নাও হরি'
আমার বিষাণে তোলো বিশ্বব্যাপী অশেষ আহ্বান !
উন্নিদ্র নয়ান ভরি' পান করি আকাশ-নীলিমা,
স্থিতি মোর যাক্ যাক্ লঙ্ঘি' স্বর্গ ধরিত্রীর সীমা
মৃত্যুর মহিমা !

উলঙ্গ লাবনি তনু লুব্ধদৃষ্টি আমারে দেখাও,
অঙ্গাভ-নির্য্যাস দিয়া মোরে তুমি লুপ্ত করি দাও
রূপের আঁধারে !
কবরী বিমানে খোলো,
মায়ার বসন তোলো.
নিশ্বসিয়া কহ কথা, লয়ে যাও রহস্য-আগারে !
ঝঙ্কার মঞ্জীর পায়ে নাচো গাহো নয়ন-সম্মুখে,
বর্ষনের নৃত্যে ভুলি, বক্ষ-বাস ফেলে দাও সুখে
—মুখ রাখো মুখে !

ঋতুবিবর্ত্তনে আমি লোকে লোকে বিচিত্র আলোকে
সাজাবো তোমার বেদী সদ্য রক্তে প্রমত্ত পুলকে
যৌবন-যৌতুকে ;
ফাগুনের অগ্নিধারে
চিত্ত দহি' ছায়ে থারে,
প্রাণ খানি মেলি দিব বৈশাখীর প্রলয় কৌতুকে।
রাখিব মন্দির তলে রক্ত পদ্ম শুভ্র শেফালিকা,
মম মন্ত্রে প্রাণ পাবে শীর্ণ শষ্প বিবর্ণ বীথিকা
ম্লান দীপ-শিখা।

করিছে যৌবন নব আজি তব উন্মত্ত সন্ধান ;
দাও মোরে দিব্য-দৃষ্টি,—মন্ত্রে দাও গোপনের প্রাণ
সহসা সঞ্চরি' !
যত জীর্ণ নগ্ন শাখী
মুকুলে ডোবাক্ আঁখি,
পত্র পুষ্প গন্ধলাস্যে দস্যু মোরে দাও দৃপ্ত করি' !
তোমার পায়ের ছন্দে শ্যাম শস্যে তোল্ তরঙ্গিমা,
মেঘেদের যাত্রা পথে লহ আঁকি মায়ার রঙ্গিমা
বিজলী-ভঙ্গিমা !

জাহ্নবীর তন্দ্রা ভাঙি' কলতানে কর হে তন্ময়
সন্ধ্যা লগ্নে ফেলি যাই দিনান্তের এ দীন সঞ্চয়
তোমার প্রাঙ্গনে।
দুর্ব্বার সমুদ্র-স্রোতে
ফেন-শুভ্র প্রান্ত হোতে
ভেসে যাই তরঙ্গের ভঙ্গে বার্ত্তা গাহি আন্‌মনে।
হাস্য-স্নাত তব ওই উচ্ছ্বসিত পূর্ণিমার প্রাণে
বিস্মিত যৌবন মোর চেয়ে থাক্ সুন্দরের পানে
জয়-দীপ্ত গানে !!

# চড়ক সংক্রান্তি

[ অধুনা-লুপ্ত 'সাধনা' হইতে সংগৃহীত ]

চৈত্রমাসে বসন্ত ও গ্রীষ্মের এই সন্ধিস্থলে পল্লীগ্রামের কৃষক জীবনে অনেকখানি প্রীতি বিকশিত হয়। গম, যব, ছোলা অরহর প্রভৃতি রবিশস্যগুলি পাকিয়া উঠে, সুতরাং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আহারাভাবে শীর্ণদেহ ক্ষুধাতুর কৃষক পরিবারকে শস্য সমাগমে আনন্দোৎফুল্ল দেখা যায়। এ সময় তরিতরকারীরও অভাব নাই; বাগানে গাছে গাছে কচি আম, গৃহ প্রাঙ্গনে সজিনা গাছে দুল্যমান অগণ্য সজনে খাড়া, পুকুরের পারে বেড়ার ধারে নিবিড়পত্র ডুমুর গাছে থোকা থোকা যগডুমুর এবং সংকীর্ণকায়া মৃদুগামিনী তটিনীর উভয় তীরে, যেখানে বালুকরাশি ভেদ করিয়া ছোট ছোট ঝরণা উঠিয়াছে এবং ছোট ছেলেমেয়ের দল তাহাদের ক্ষুদ্র হস্তে বালির বাঁধ দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সেই ঝরণার জল আটকাইতে চাহে—ক্ষুদ্র শিশু হস্ত রচিত সেই সকল আইলের আশেপাশে রাশি রাশি সবুজ শুষনির শাক গ্রাম্য কৃষক পরিবারের তরকারীর অভাব দূর করে। সকলের ঘরেই ময়দা, খেজুরে গুড়, যবের ছাতু, বুটের ডাল সঞ্চিত আছে। যে সকল কৃষকের অবস্থা ভাল তাহাদের দুগ্ধবতী গোরুরও অভাব নাই; তাহারা কিম্বা সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন গোয়ালার গো দুগ্ধ হইতে সঞ্চিত ননি জাল দিয়া ঘৃত পর্য্যন্ত সংস্থান করিয়া রাখে, সুতরাং যখন কোন গোপ কিম্বা কৃষকরমণী তাহার ক্ষুদ্র শিশুর কালো কুচকুচে শরীর প্রচুর তৈলে এবং অল্পজলে অভিষিক্ত করিয়া ও তাহা সযত্নে মুছাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য অনুচ্চস্বরে সুর করিয়া বলে—

"খোকা যাবে মোষ চরাতে খেয়ে যাবে কি ?
আমার শিকেয় উপর গোমের রুটি তবলাভরা ঘি।"

তখন এই ছড়া শুনিতে শুনিতে মাতৃক্রোড়শায়ী সেই কৃষকশিশুর রসনেন্দ্রিয় উপাদেয় গোমের রুটি এবং তবলাভরা সদ্যোজাত ঘি আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হোক না হোক আমরা কিন্তু এই ছড়ার সুরে ও তাহার প্রত্যেক কম্পনে শুধু যে সেই অশিক্ষিত অসভ্য পরিবারে একটি সুকোমল মাতৃহৃদয়ের স্নেহমধুর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই তাহা নহে, তাহাদের পারিবারিক জীবনের একটি অমল সুন্দর শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যছবি নয়ন সমক্ষে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

*
* *
*

আগে আগে চৈত্রের পনেরই তারিখ হইতেই চড়কের ঢাক বাজিয়া উঠিত; এবং সেই সময় হইতে পল্লীবাসী কৃষক, রাখালের দল, ঘরামী, মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া গাজনের হুজুগে মাতিত।

*
* *
*

প্রত্যেক গ্রামেই তিন চারিটি করিয়া দল থাকে, গ্রাম বড় হইলে দলের সংখ্যা আরো বেশী হয়। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া দলপতি আছে, তাহাকে "মূল-সন্ন্যাসী" বলে। মূল সন্ন্যাসীর জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ হওয়া নিতান্ত আবশ্যকীয় নহে, কৈবর্ত্ত গোয়ালা, বণিক, গণ্ডক প্রভৃতি যে কোন জাতি মূল সন্ন্যাসী হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণত বয়স্ক হওয়া দরকার। শিবের সিংহাসন টানিয়া বেড়ান, নিয়মিতরূপে শিব পূজা করা, দলস্থ

অন্যান্য সন্ন্যাসীকে পরিচালিত করা মুল সন্ন্যাসীর কাজ, এতদ্ভিন্ন তাহার আরো দুই একটি কাজ আছে সে কথা আমরা পরে বলিব।

চৈত্র সংক্রান্তির দশদিন পূর্ব্বে মুল সন্ন্যাসী ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা পবিত্র হইয়া ক্ষুদ্র কাষ্ঠ সিংহাসনে একটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ গাজন তলায় আগুড়া জমকাইয়া বসে। মহাদেবের এই সকল নৈমিত্তিক সেবক এই সময় স্ব স্ব বাড়ীতে থাকে না, কোন বৃক্ষতলে বা বনান্তরালে ইহাদের এক এক আড্ডা আছে তাহাকেই "গাজনতলা" বলে। এক এক পাড়ায় এক একটি নির্দ্দিষ্ট গাজনতলা আছে, যে বৎসর যে লোকই মুল সন্ন্যাসী হৌক—সেই সকল গাজন-তলাতে তাহাদের আড্ডা ফেলিতেই হইবে।

'গাজনতলা'গুলির চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। নিকটে কোথাও জনমানবের ঘরবাড়ী নাই। চারিদিকে শ্যাওড়া এবং ভাঁট বন, ভাঁটফুলের সুগন্ধে জঙ্গলটি পরিপূর্ণ, নিকটে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল গাছের সারি, দুই একটি তমাল ও বেলগাছ বা বাঁশের ঝাড়, সমস্ত বৎসর এখানে মনুষ্য সমাগম হয় না। কেবল এই সময় যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরিষ্কার করিয়া সন্ন্যাসীর দল খেজুরপাতায় ছাওয়া ক্ষুদ্র কুটীর তুলিয়া সেখানে শিবস্থাপনা করে এবং সন্নিকটবর্ত্তী বট পাকুড় অথবা তেঁতুল গাছের প্রচ্ছন্ন ছায়ায় আড্ডা পাতিয়া লয়।

ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা আপনাকে পবিত্র করিয়া মুল সন্ন্যাসী পৈতা গলায় দেয়। এই পৈতা ব্রাহ্মণের উপবীতের ন্যায়, ইহা শুধু তাহাদের গলায় ঝুলিতে থাকে, পৈতাগুলি হরিদ্রারঞ্জিত, এবং তাহাতে একটি করিয়া পিতলের আঙটি ঝুলিতে দেখা যায়।

মুল সন্ন্যাসীর সঙ্গে আরো অনেকে দাড়ি গোঁফ্ কামাইয়া সন্ন্যাসী হয়; চড়ক সংক্রান্তির দশদিন আগে যাহারা কামায় তাহাদের কামানোর নাম "দশের কামান"—এইরূপ কামানোর দিন অনুসারে সাতের কামান, পাঁচের কামান, তিনের কামান নাম হইয়াছে। তিনের কামানই শেষ কামান। কামানর পর এবং উৎসব শেষ হইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদের কোনও গৃহকর্ম্মে যোগ দিবার যো নাই, শুধু দলের সঙ্গে ঘুরিয়া ভিক্ষা করা এবং গাজনতলায় রাত্রি যাপন করাই ব্যবস্থা; সুতরাং যাহারা খুব কাজের লোক, অথচ একটু সখের বাতিকও আছে তাহারা আগে না কামাইয়া শেষ দিন অর্থাৎ তিনের কামানর দিন কামায়। অনেকে মোটেই কামায় না, সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া খানিক আমোদ করিয়া আসে।

কি মুল সন্ন্যাসী কি তাহার অনুচরবর্গ সকলের হাতেই বেতের এক রকম ছড়ি দেখা যায়, চার পাঁচ গাছ সরু বেত একত্র করিয়া ঝাঁটার মত বাঁধিয়া এই ছড়ি তৈয়ারী হয়, সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন ইহা তাহাদিগের হাতে থাকে।

*

* * *

সন্ন্যাসীরা সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত লোকের বাড়ী সিংহাসন সমেত শিব মাথায় করিয়া ভিক্ষা করে—যত গোয়ালা ও কৈবর্ত্তের ছেলে পায়ে নূপুর বাঁধিয়া ভাল কাপড় পরিয়া বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে গ্রামস্থ গৃহস্থ ও ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। লোকে ইহাদিগকে ঠিক ভিক্ষুকের হিসাবে দেখে না, সুতরাং ইহাদিগের ভিক্ষার ধানীতে অধিক পরিমাণে চাল-ডাল দান করে। ভিক্ষা করিয়া ইহারা যাহা পায়, সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া আসিয়া তাহাই রাঁধে এবং একত্র আহারাদি করে।

* * অপরাহ্নে প্রত্যেক গাজনতলাতেই অনেকগুলি ঢাক বাজিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। সন্ন্যাসীদলের অবিশ্রান্ত নৃত্যে মাটী কাঁপিতে থাকে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত গাজন-তলার চারিদিকে সমবেত হইয়া ইহাদিগের প্রমোদ নৃত্য নিরীক্ষণ করে * * *

নাচিতে নাচিতে কোন সন্ন্যাসীর অতিরিক্ত ভাবোদয় হয়; তাহারা মাটীর উপর উবু হইয়া পড়িয়া যায় এবং অবনত মুখে ঢাকের বাজনার তালে তালে সবেগে মাথা নাড়িতে থাকে—ইহাকে "বয়াল খাটা" বলে। ভাবোন্মত্ত

সন্ন্যাসীগণ শুধু বয়াল খাটিয়াই ছাড়ে না, এই রকম করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে হামা দিয়া' অনেক দূরে চলিয়া যায় এবং কখন কখন বনের মধ্যে কি গর্ত্তে গিয়া পড়ে। শুনিয়াছি যখনই ইহাদের উপর মহাদেবের ভর হয় ইহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে, তখন ঢাক আরো বেশী জোরে বাজিয়া উঠে এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের "বলো শিবো মহাদেব দেব" ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হয়।

* * *

সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে গ্রামের সমস্ত সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া দল বাঁধিয়া নদীকূলে যায়; তাহার পর তাহাদের বেত্রদণ্ড হাতে লইয়া নদীর জলে নামিয়া চড়ক গাছের অনুসন্ধান করে। পূর্ব্বে পিঠ বা হাত ফুঁড়াইয়া চড়কে পাক খাওয়ার নিয়ম ছিল, কিন্তু ইদানীং পিনাল কোডের চোটে তাহা উঠিয়া গিয়াছে এবং তদবধি চড়ক গাছ মহাশয় নদীর জলে গা ঢাকা দিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। সম্বৎসরের পরে এই দিনে সন্ন্যাসীরা এই সুদীর্ঘ চড়কগাছ নদীতীরে টানিয়া তোলে এবং তাহার যথারীতি পূজা করিয়া আবার জলের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়া আসে।

* * *

চড়কের পূজা শেষ হইলে সন্ন্যাসীগণ ঢাক বাজাইয়া পূর্ব্ববৎ নাচিতে নাচিতে নিজ নিজ গাজনতলায় ফিরিয়া আসে। এই দিন রাত্রে ফল ভক্ষণ করিতে হয়, ফলাহারের ব্যাপারটি বিশেষ আয়োজনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। দিবসে ভিক্ষা করিবার সময় এই দিন ইহারা অনেক ফল ভিক্ষা পায়; তদ্ভিন্ন গাছ হইতে সুপক্ক নোনা, বেল, পেপে, পিয়ারা পাড়িয়া আনে, পল্লীগ্রামে নারিকেল গাছের অভাব নাই, দু চার কাঁদি নারিকেলও বৃক্ষস্বামীর অসাক্ষাতে চাহিয়া আনে। * * * অনেক রাত্রে ইহারা আগুন জ্বালিয়া এবং কণ্টকময় কুলের ডাল জড় করিয়া তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করে।

* * *

রাত্রিশেষে 'কাকবলী' দিবার নিয়ম। কাকবলী জিনিষটার সঙ্গে বোধ করি অধিক পাঠকের পরিচয় নাই। সন্ন্যাসীরা চড়কপূজার সময় শিবেরই উপাসনা করিয়া থাকে, অতএব শিবের অনুচর ভূতগণের প্রতি কিঞ্চিৎ সদাচার না করিলে পাছে সেই সকল অপদেবতা অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়ে সন্ন্যাসীরা এই দিন রাত্রে ভূতের প্রীত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ আহারের যোগাড় করে। এবং ভাত শোল-মাছের ঝোল ও অম্বল রাঁধিয়া একটা মালসাতে লইয়া শেষরাত্রে ভূতমহাশয়ের সন্ধানে যায়। রাত্রি তিন চারিটার সময় সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী এবং শুদ্ধাচারী মূল সন্ন্যাসী সেই মালসাটি লইয়া নদীর দিকে অগ্রসর হয়; পাঁচ সাত জন বলবান সন্ন্যাসী তাহাকে বাহু দ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া চলে। এইরূপে চলিতে চলিতে তাহারা নদীর জলে নামে, জল যখন এক বুক হয় তখন সেই মালসা ভাসাইয়া দেয়, এবং সাগ্রহে ভূতগণকে আহ্বান করিয়া সেই খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে।

* * *

চড়ক সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীদিগের সাজ সজ্জার দিকে মনোযোগ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি হয়। অপরাহ্নে 'ধূপবাণ' খেলিতে হইবে, তাহারই আয়োজনে ইহারা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সকল সন্ন্যাসীই স্ব স্ব পরিচিত অবস্থাপন্ন ভদ্র প্রতিবেশীর নিকট হইতে তাঁহাদের স্ত্রী কন্যাদিগের, পট্টবস্ত্র, শান্তিপুরে ডুরে, গুলবাহার প্রভৃতি শাড়ী এবং গোঠ, চন্দ্রহার, চিক্, পাঁচনর, বাজু, বালা, তাবিজ, প্রভৃতি গহনা চাহিয়া আনিয়া তদ্দারা স্ব স্ব দেহ সজ্জিত করে, এই সমস্ত বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইলে এই সকল কৃষ্ণকায় চাষার ছেলেদের কিম্ভুতকিমাকার দেখিতে হয়। তাহার পর ইহারা ধুনো কিনিয়া আনিয়া তাহা উত্তমরূপে পিষিয়া মালসা পূর্ণ করে ও তৈলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া রাখে; এই ধুপ এবং তৈলে অভিষিক্ত বস্ত্রখণ্ড 'ধুপবাণ' খেলার প্রধান উপকরণ। এদিকে কে কি রকম সঙ বাহির করিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় মিটিং বসিয়া যায়।

বেলা শেষ হইতে না হইতে চারিদিক হইতে তুমুল বেগে ঢাক বাজিয়া উঠে। সন্ন্যাসীগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত

হইয়া এক একটি বাণ লইয়া নদী তীরে সমাগত হয়। এই বানগুলি দেখিতে অনেকটা সেকরাদের সাঁড়াসীর মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর, তাহার দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ এবং মাথার দিকটা ঠোঁট বাহির করা, তাহারই নিকট একটা করিয়া লোহার শিকলী লাগান থাকে। * * * ইহারা নদী তীরে শিবের সিংহাসন বহিয়া আনে। নদীকূলে সেই সিংহাসন নামাইয়া শিব পূজা করা হয়; অনেকে ধোপাদের কাপড় কাচিবার পাটের মত এক এক খানা পাট ঘাড়ে করিয়া যায়, তাহাকে যথারীতি সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া পূজা করে। তাহার পর মূল সন্ন্যাসী অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের চক্ষু পানের পাতা দিয়া ঢাকিয়া বাণের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দুই পাঁজরের মাংসে বিঁধাইয়া দেয়, এবং গলদেশে পূর্ব্বকথিত শিকলী বাঁধিয়া বাণগাছটা বেশ আটকাইয়া রাখে; ইহাতে এই ফল হয় যে দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া যখন তাহারা সবেগে নৃত্য করে তখন বাণ খুলিয়া পড়িতে পায় না।

* * *

বেলা শেষ হইতে না হইতে নানা রকমের সঙ বাজারে আসিয়া জড় হয়। * * কেহ একটা মুখোস পরিয়া গায়ে খানিকটা চিটাগুড় ও কতকগুলি শিমুলের তুলায় কৃত্রিম লোম লাগাইয়া এবং চাদর পাকাইয়া তাহারই একটা লেজ বাঁধিয়া বাঘ সাজিয়া হাজির হয়, * * * অন্যত্র একজন বৈরাগী অন্য একজন বাবাজীর সেবাদাসীকে সঙ্গে লইয়া খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে এবং "বেলা গেল ও ললিতে কৃষ্ট এলো না" এই গান গাহিতে থাকে।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসে। * * একদল যাইতেছে, আর একদল আসিতেছে, ঢাক বাজিতেছে, এক সঙ্গে সন্ন্যাসীদের পা উঠিতেছে পড়িতেছে, বাণের আগায় ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া আলো জলিতেছে এবং মিনিটে মিনিটে সেই আলোতে যুগপৎ এক এক মুঠো ধূপের গুঁড়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। * * আলোকদীপ্ত ধূম অন্ধকারপূর্ণ আকাশ তলে অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া দেয়, ঢাক আরো সজোরে বাজিয়া উঠে; ঘর্ম্মাপ্লুত দেহ সন্ন্যাসীর দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া শূন্যে দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আরো বেশী উৎসাহের সঙ্গে নাচিতে থাকে।

এইরূপে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে সমস্ত দল প্রথমে শিবমন্দিরের প্রাঙ্গনে তাহার পর কালীতলায় সমবেত হয়। সেখানে অনেকক্ষণ নৃত্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দল স্ব স্ব গাজনতলায় ফিরিয়া আসে, আসিবার সময় গ্রামস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে একবার তাহাদের নৃত্যকৌশল দেখাইয়া যায়।

* * *

ক্রমে রাত্রি অধিক হয়। গাজনতলায় ঢক্কাধ্বনি ও কলরব থামিয়া যায়, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম উন্মত্ত আনন্দোচ্ছ্বাসের পর শ্রান্তিভরে ঘুমাইয়া পড়ে; শুধু আকাশের অগণ্য নক্ষত্র মিটি মিটি চাহিয়া থাকে এবং উচ্ছৃঙ্খল বায়ু প্রবাহে গাছের পাতা এবং বাঁশবন ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠে, তাহাতে বোধহয় যেন একটি পরমায়ুহীন বৎসর তাহার আনন্দ এবং বিষাদপূর্ণ বিচিত্র স্মৃতিভার বক্ষে লইয়া এই অন্ধকার সমাচ্ছন্ন নিদ্রাহীন স্তব্ধ নিশীথিনীর সুকোমল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

রমঁ্যা রলাঁ

[ শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী অনূদিত ]

দ্বিতয় খণ্ড

## প্রভাত

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

মিন্‌না

দুই দিন পরে ক্রিস্‌তফ্‌ আবার মিন্‌নাদের বাড়ী গেল। এখন তাহার নূতন কাজ—মিন্‌নাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইবে; সেই উপলক্ষ্যে সে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত দুইবার করিয়া যায়। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যায়ও হাজির হইয়া বাজায়, গল্প করে।

মিন্‌নার মা ছেলেটিকে পছন্দ করিতে লাগিলেন। পঁয়ত্রিস্‌ বছর বয়সে তাঁহার স্বামী বিয়োগ হয় এবং শরীরে ও মনে যথেষ্ট তারুণ্য থাকিলেও লোক-সমাজের আমোদ উৎসবাদি হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। স্বামীর স্মৃতি তাঁহার মধ্যে একটি সংযম আনিয়া দিয়াছিল,—কন্যাটির শিক্ষায় তাঁহার সমস্ত মন তিনি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এ রকম স্থলে প্রায়ই দেখা যায় একান্ত স্নেহ অত্যাচার হইয়াই দাঁড়ায়। ভালবাসা দিবার ও পাবার আধার ও অবলম্বন যখন একটি মাত্র প্রাণী, তখন মাতৃস্নেহও কেমন যেন একটা উগ্র অসামঞ্জস্যের মধ্যে গিয়া পড়ে। কিন্তু মিন্‌নার মা তাঁর প্রকৃতিগত সংযমের বলে ওজন ঠিক রাখিতে পারিয়াছিলেন। মেয়েকে খুব ভালবাসিলেও তার দোষ ত্রুটি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেন। তাঁর স্বাভাবিক রস-জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমস্ত জিনিষ পরিষ্কার করিয়া ধরিতে সাহায্য করিত, মানুষ যেখানে দুর্ব্বল, হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে, তিনি চকিতে বুঝিয়া লইতেন। তাঁর বিদ্রূপ-দৃষ্টি চির জাগ্রত, অথচ তাহার মধ্যে অসূয়ার লেশমাত্র ছিল না; পরিহাসে যেমন পটু, ক্ষমায়ও তেমনই উদার বলিয়া মানুষকে যেমন বিদ্রূপ করিতেন, তেমনই সর্ব্বদা যথাশক্তি সাহায্যও না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

তরুণ ক্রিস্‌তফের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তাঁর স্নেহধর্ম্মী

মনটি গিয়া পড়িল। সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও সঙ্গীত তাঁহার ভাল লাগিত। এইখানে ক্রিস্‌তফের সঙ্গে তাঁর একটি মিল ছিল। ক্রিস্‌তফের সরলতা, সাহস, নিজের সুখদুঃখে উদার উপেক্ষা,—তার প্রত্যেক সদগুণটি মহিলাটির চোখে পড়িয়াছিল; অথচ তিনি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেন যে, ক্রিস্‌তফের শিক্ষায় ও স্বভাবে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। রাজ-প্রাসাদে চাকুরির উপলক্ষ্যে বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশিলেও আচারে ব্যবহারে সে বেশ একটু 'বুনো' রকমের; এই মানুষটিকে সভ্যভব্য করিয়া তুলিবার ভার মহিলাটি মনে মনে গ্রহণ করিলেন, অথচ ক্রিস্‌তফ্‌কে বুঝিতে দিলেন না। উপদেশ দিয়া তিনি ক্রিস্‌তফ্‌কে বিব্রত করিতেন না। মিন্না্‌র সঙ্গে একত্র পড়া আলো-চনাদি উপলক্ষ্যে স্বদেশের ও বিদেশের বড় কবি, শিল্পী ঐতিহাসিকদের রচনা তিনি পড়াইতেন। স্নেহশীলা নারী অসহায়, সরল ছেলে পাইলে আপনা হইতে এ রকম করিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রিস্‌তফ্‌ ভাবিত যে, এই স্নেহ ভালবাসা বিশেষভাবে তাহারই, সে যেন নিজগুণে টানিয়া লইতেছে।

মিন্নার সঙ্গে ক্রিস্‌তফের সম্বন্ধ কিন্তু বেশ একটু অন্য রকম। প্রথম যে দিন সঙ্গীত শিক্ষা দিতে ক্রিস্‌তফ্‌ বসিল, সে দিনও মিন্নার সেই প্রথম মিলনের স্নিগ্ধ দৃষ্টির মোহ কতকটা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, মিন্না যেন আর এক মানুষ, সে তাহার দিকে চায় না, তাহার কথা শোনে না, তাহার চোখে চোখ পড়িলে সেখানে এমন একটা ঔদাসীন্য ভাসিয়া উঠে যে, ক্রিস্‌তফ্‌ যেন জমিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সে প্রাণপণে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে কোথায় তার অপরাধ, কই কিছুই তো তার মনে পড়ে না,—তবুও মিন্নার ঔদাসীন্য এতটুকুও কমে না। প্রথম দিন সে যে একটু মিষ্টি করিয়া হাসিয়াছিল, সে তো নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য! এত সহজে ক্রিস্‌তফের হৃদয়কে সে জয় করিতে পারে, ইহা বুঝিবামাত্র তাহার সকল আগ্রহ যেন উবিয়া গেল! ক্রিস্‌তফের বেয়াড়ামোগুলোই সব চেয়ে তাহার চোখে পড়িত—ছেলেটার শিক্ষা নাই, শিষ্টতা জানে না, পিয়ানোটা ভাল বাজায় বটে, কিন্তু মাগো! হাতের গড়নটা কি কদর্য্য, তার উপর টেবিলে বসিয়া ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করিতেও জানে না! অথচ মিন্নার কোনও সঙ্গী না থাকায় ক্রিস্‌তফ্‌কে লইয়াই আমোদ আহ্লাদ করিতে হইত। ভুলক্রমে তার দৃষ্টিতে যদি স্নিগ্ধতা ভাসিয়া উঠিত, ক্রিস্‌তফ্‌ তাহাতেই আকুল হইয়া উঠিত! মিন্নার বয়সে মেয়েরা বাস্তবের চেয়ে কল্পনাকে বেশী ভালবাসে। স্বপনের ঘোরে কত প্রেমের কথা, কত প্রেমিকের ছবি মিন্না মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে; কখনও সে এক বিজয়ী বীরের সহধর্ম্মিনী, কখনও একজন মস্ত কবির প্রণয়িনী, এমনই করিয়া স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে সে ভাসিয়া বেড়ায়; অথচ এই স্বপ্নবিধুর মেয়েটি ভিতরে ভিতরে বেশ হুঁসিয়ার, বেশ হিসাবী।

সরল ক্রিস্‌তফ্‌, হৃদয়-রাজ্যের এই সব জটিলতা, বিশেষত নারীচিত্তের অদ্ভুত বৈচিত্র্য কিছুই বুঝিত না। তাহার এই বন্ধু দুটিকে প্রাণপণে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াও সে নিষ্ফল হইত, অথচ তাহাদের একটু স্নেহ-দৃষ্টি, একটু মধুর সম্ভাষণ তাহাকে আনন্দে বিভোর করিয়া দিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিস্‌তফ্‌ ভক্ত পূজারীর মত মিন্নাদের বাড়ী কাটায়, রাত্রে বিছানায় আসিয়া চোখ বুঁজিবামাত্র তার মনে উপাস্য দুটির মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। ভালবাসা কি জিনিষ, তাহা সে এখনও জানে না, তবু সে ভাবে সে যেন ভালবাসিয়াছে। কিন্তু কাহাকে? মিন্নাকে, না তাহার মাকে? সে গম্ভীর ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করে, অথচ স্থির করিতে পারে না; যদি একজনকেই বাছিতে হয়, তাহা হইলে মিন্নার মাকেই সে ভোট দিবে!

এইটি আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই সে মিন্নাকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। মিন্নার নিষ্ঠুরতা ও অবজ্ঞায় সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বেশী দেখা শোনার ফলে ক্রিস্‌তফের সাহসও একটু বাড়িতে-ছিল, সুতরাং তাহাকে খোঁচা দিলে সেও এখন মিন্নাকে পালটা জবাব না দিয়া ছাড়িত না। এইভাবে দুজনের মধ্যে নুতন রকম দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল। মা, বসিয়া দেখিতেন এবং হাসিতেন; এ যুদ্ধে ক্রিস্‌তফ্‌ সর্ব্বদাই হারিত এবং বিষম চটিয়া সে মনে করিত সে মিন্নাকে ঘৃণা করে,

শুধু তার মা'র জন্যেই তাহাদের বাড়ী যায়। যাহা হউক, সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সকালে সে মিন্‌নাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া যায়; মিন্‌না প্রায়ই দেরী করিয়া আসে, তাহার চক্ষু তখনও নিদ্রা-জড়িত, ব্যবহার কেমন আড়ষ্ট, নেহাৎ মামুলী রকমে একবার হাত ছুঁইয়া অভিবাদন করে এবং গম্ভীর হইয়া পিয়ানোতে বসে। সে মন্দ বাজায় না, কিন্তু সঙ্গীতে তাহার উৎসাহ নাই; বাঁধা-গৎ অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বেশ বাজাইয়া যায়, কিন্তু বাজনাটা সেখানে অজুহাত মাত্র, মনে মনে সে স্বপ্নের জাল বুনিতে থাকে। এমন সময় ক্রিস্‌তফ্‌ নূতন ও কঠিন রাগ রাগিনীর আলাপ তাহাকে শিখাইতে যায়, জোর করিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, এবং মিন্‌নাও ইচ্ছা করিয়া খারাপ বাজাইয়া তাহার প্রতিশোধ লয়।

ক্রিস্‌তফ্‌ যে আজকাল খুব ভদ্র ব্যবহার করে, তা নয়। ভাল বাজাইলেও প্রশংসা বড় একটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় না। মিন্‌না চটিয়া যায়, এবং প্রত্যেক কথার বেশ কড়া রকম জবাব দিয়া চলে। তর্ক করা যেন তাহার স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি যখন ভুল করিয়াছে, তখনও সে বলিবে যেমন স্বরলিপিতে আছে, তেমনই সে বাজাইতেছে। ক্রিস্‌তফ্‌ চটিয়া যায়, মিন্‌না বেশ উপভোগ করে। এই নিষ্ঠুর যুদ্ধে দুইজনেই অস্থির হইয়া উঠে, অথচ স্পষ্ট করিয়া কেহই কিছু বলিতে পারে না। এই একটানা বিরক্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মিন্‌না নানান্‌ কৌশল আবিষ্কার করিতে থাকে, যেমন করিয়াই হোক্‌ ক্রিস্‌তফের কাজটা পণ্ড করিতে হইবে, বাজনা থামাইতে হইবে। কখনও তাহার কাশি আসে, কখনও তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া যায়, কখনও চাকরাণীকে একটা অত্যন্ত জরুরী কথা বলিবার দরকার হয়। এ সব যে ছলনা মাত্র তাহা ক্রিস্‌তফ্‌ বেশ বুঝে। এবং ক্রিস্‌তফ্‌ যে বুঝিতে শিখিয়াছে, তাহা মিন্‌না জানে; তবু সে যে কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিবে না, ক্রিস্‌তফের মুখ যে খানিকটা বন্ধ, ইহাতেই তাহার সুখ। সুতরাং অভিনয় চলিতে থাকে।

একদিন এই অভিনয়ে একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল। মিন্‌না কাশিতে কাশিতে প্রায় শ্বাস রোধের অবস্থায় যেন আসিয়াছে, অথচ ক্রিস্‌তফের গজ্‌রানিটা বেশ উপভোগ করিতেছে, এমন সময় মিন্‌নার মাথায় একটি মতলব খেলিল। সে চট্‌ করিয়া তাহার রুমালখানা মাটিতে ফেলিয়া দিল, যেন হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে। ক্রিস্‌তফ্‌ কুড়াইয়া রুমালখানি মিন্‌নাকে দিল, অথচ তাহার ব্যবহারে সৌজন্যের লেশমাত্র ছিল না। মিন্‌না এমন জাঁকাইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিল যে তাহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে ক্রিস্‌তফ্‌ যেন ক্ষেপিয়া গেল। পরের দিন মিন্‌না আবার রুমালটা ফেলিয়া ক্রিস্‌তফ্‌কে পরীক্ষা করিতে গেল। ক্রিস্‌তফ্‌ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, এক পা'ও নড়িল না। মিন্‌না ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, আমার রুমালখানা কুড়িয়ে দেবেন কি? ক্রিস্‌তফ্‌ আর সহ্য করিতে পারিল না। কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কুড়োতে হয় নিজে কুড়িয়ে নাও, আমি তোমার চাকর নই। মিন্‌না একেবারে চটিয়া আগুন! আসন হইতে উঠিয়া দুম্‌ করিয়া পিয়ানোটা বন্ধ করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রিস্‌তফ্‌ খানিক অপেক্ষা করিল, মিন্‌না ফিরিল না; নিজের ব্যবহারে ক্রিস্‌তফ্‌ এখন বেশ অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদি মিন্‌না তার মায়ের কাছে নালিশ করে, যদি তাঁর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়! ক্রিস্‌তফ্‌ ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল, অথচ কি করিবে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

পরের দিন ভয়ে ভয়ে সে তাহাদের বাড়ীতে গেল। ভাবিয়াছিল মিন্‌না বুঝি আর দেখা দিবে না। কিন্তু মিন্‌না এ সব কথা প্রকাশ করিবার মেয়ে নয়, তাহাতে তাহার আত্ম-মর্য্যাদায় ঘা লাগে। যাহা হউক কোনও দিকে মুখ না ফিরাইয়া, কোনও কথা না বলিয়া সে বাজাইতে বসিয়া গেল, যেন কিছুই হয় নাই, যেন ক্রিস্‌তফ্‌ নাই! এমনই করিয়া দিনের পর দিন দুজনে দুজনকে কি যন্ত্রণাই দিয়াছে।

* *

*

মার্চ্চ মাসের সকাল—কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন; বাহিরে বরফ পড়িতেছে। পিয়ানোর সম্মুখে ক্রিস্তফ্ ও মিন্না বসিয়া আছে। ভোরের আলো তখনও অস্পষ্ট; বাজাইতে বাজাইতে ভুল স্বর ছুঁইতেই ক্রিস্তফ্ ধরিয়াছে, মিন্না তাহার অভ্যাস মত তর্ক করিতেছে; ক্রিস্তফ্ স্বরলিপির উপর ঝুঁকিয়া ভুলটা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে। মিন্নার আঙুলটি স্বরলিপির যে অংশ ছুঁইয়া আছে, ক্রিস্তফের মুখটা সেই দিকে নামিয়া আসিল—সে কি স্বরলিপি পড়িতেছে? কই, কিছুই তো দেখিতেছে না। সে দেখিতেছে ফুলের পাপ্ড়ির মত কি একটি সুন্দর মিষ্টি জিনিষ তার সম্মুখে। হঠাৎ কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই ক্রিস্তফ্ দেখিল যে, সেই ছোট্ট হাতখানির উপর সে একটি চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

দুজনেই স্তম্ভিত! ক্রিস্তফ্ যেন লাফ্ দিয়া হটিয়া গেল! মিন্না বিদ্যুতের মত হাত দুখানি সরাইয়া লইল—দুজনেই লাল, কাহারও মুখে কথা নাই। কেহ কাহারও দিকে চাহিতেও পারিতেছে না।

এই বিক্ষুব্ধ মৌন কাটাইয়া মিন্না আবার বাজাইতে আরম্ভ করিল, শব্দের আবরণে তার অস্বস্তি সে যেন ঢাকিতে চায়। ক্ষণে ক্ষণে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে। কি একটা অসহ্য ভার যেন সেখানে চাপিয়া আছে; বে-পরদায় হাত পড়িয়া বে-সুর বাজিতেছে, অথচ ক্রিস্তফের হুঁস্ নাই; সে যেন অত্যন্ত অধীর, তাহার মাথাটা দব্‌দব্ করিতেছে, সে কিছুই শুনিতে পাইতেছে না। মিন্না কি বাজাইতেছে, সে বুঝিতেছে না। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাহির হইল শুধু কয়েকটি অসংলগ্ন কথা—তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়াছে; সে ভাবিতেছে মিন্নার সঙ্গে বুঝি সব শেষ হইল। কি নির্ব্বোধ, কি অভদ্র সে! কেন এমন কাজ সে করিয়া বসিল? বাজানো শেষ হইবা মাত্র সে কোনও দিকে না তাকাইয়া সরিয়া পড়িল, বিদায় লইতেও ভুলিয়া গেল। অথচ মিন্না ইহাতে কিছুই মনে করিল না, ক্রিস্তফ্‌কে মোটেই সে ইহার জন্য অভদ্র ভাবে নাই; এই প্রথম মিন্না আগ্রহ ও সহানুভূতির সঙ্গে ক্রিস্তফের দিকে তাকাইল। সারাক্ষণ কেমন যেন নূতন চোখে সে ক্রিস্তফ্‌কে দেখিতেছিল, তাইত বারে বারে ভুল পর্দ্দায় হাত পড়িতেছিল।

ক্রিস্তফ্ চলিয়া গেল। মিন্না একা। সে তার মায়ের সঙ্গে অভ্যাসমত দেখা করিল না। নিজের ঘরে গিয়া সমস্ত ঘটনাটি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল। আয়নার সম্মুখে গালে হাত দিয়া সে বসিয়া আছে, তাহার চোখে আজ যেন নূতন দীপ্তি, নূতন স্নিগ্ধতা। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া সে ঠোঁট কামড়াইতেছে। সজাগ হইয়া নিজের সুন্দর মুখখানি খুশী হইয়া দেখিতে দেখিতে সেই ঘটনা হঠাৎ মনে পড়িল, আবার লজ্জায় লাল! খাবার সময় টেবিলে সে স্ফূর্ত্তির বাণ ডাকাইয়া দিল; খাবার পর ঘরে একটা সেলাই লইয়া বসিল, বার বার সেলাইয়ে ভুল হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া সে একটি কোণে বসিয়া আছে, হঠাৎ সে এক লাফে ঘরের মাঝখানে আসিয়া গান গাহিয়া উঠিল। মা চম্‌কাইয়া বলিলেন, ক্ষেপে গেলি না কি? মিন্না হাসি আনন্দের ঝর্ণার মত মা'র ঘাড়ে পড়িয়া মাকে চুম্বন করিল।

রাত্রে বিছানায় শুইতে মিন্না কেবলই দেরী করিতেছে! সেই আয়নার সম্মুখে বসিয়া সে যেন কত কথাই ভাবিতেছে! কি ভাবিতেছে? কিছুই না। পোষাক খুলিয়া ধীরে ধীরে সে বিছানায় বসিল, মনে আনিতে চেষ্টা করিল ক্রিস্তফ্ মানুষটা কেমন। কল্পনায় সে একটি ক্রিস্তফ্‌কে গড়িয়া তুলিতেছে। কই, ক্রিস্তফ্ তো ততটা বিশ্রী নয়। বাতি নিবাইয়া মিন্না শুইয়া পড়িল। কিছু পরেই সকালের ঘটনাটি মনে আসিতেই মিন্না হাসিয়া উঠিল। তার মা আস্তে আস্তে ঘরে আসিলেন—তাঁর হুকুম অমান্য করিয়া মিন্না কি এত রাত্রেও পড়িতেছে! কই না, মিন্না তো চোখ চাহিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। তোর হয়েছে কি? এত রাত্রে হেসে বাড়ীর লোকদের চম্‌কে দিচ্ছিস্? কি এমন মজার জিনিষ ঘট্‌ল?

কিচ্ছু না, মা,—এই আমি ভাব্‌ছিলুম।

ভারী ভাবুক্ হয়েছেন! যাক্ নিজের ভাবনায় নিজে হেসে অস্থির না হ'লেও চলবে, এখন ঘুমো।

হাঁ, ঘুমচ্ছি মা—বাহিরে মিন্না নরম গলায় বলিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে গজরাইতে ছিল—আঃ মা গেলে বাঁচি! দরজাটা আবার বন্ধ হইতেই সে নিজের স্বপ্ন লইয়া মাতিয়া উঠিল। সেই স্নিগ্ধ স্বপ্নের ঘোরে সে যেন কোন্ আনন্দ-সাগরে তলাইয়া যাইতে লাগিল! হঠাৎ আধ-ঘুম অবস্থার মধ্যে সে বলিয়া উঠিল, সে আমায় ভালবাসে। উঃ কি মিষ্টি, কি সুখ। আমি তাকে কত ভালবাসি—বালিসের উপর চুম্বন দিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের দিন ক্রিস্তফ্ মিন্নার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল! এ মাধুর্য্য এতদিন কোথায় লুকান ছিল! সেই পরিচিত অভিবাদনের মধ্যে আজ এ কি সুর বাজিতেছে। কেমন বাধ্য মেয়েটির মত মিন্না বাজাইতে বসিল। কি সলজ্জ গম্ভীর তার মুখখানি। ক্রিস্তফ্‌কে জ্বালাতন করা তো দূরের কথা, সে ক্রিস্তফের প্রত্যেক উপদেশ একেবারে বেদবাণীর মত পালন করিতে চেষ্টা করিতেছে। একটু ভুল করিলেই নিজে চম্‌কাইয়া শুধ্‌রাইতেছে। অল্প দিনের মধ্যেই তার বাজনায় আশ্চর্য্য উন্নতিই দেখা গেল। ক্রিস্তফ্ তো অবাক্, বাজনা শুধু নিখুঁত নয়, তার ভিতর দিয়া যেন কে কথা বলিতেছে। প্রশংসা করিতে ক্রিস্তফ্ বড় অভ্যস্ত নয়, তবুও সে তাহার মতন করিয়া প্রশংসাটা জানাইতে লাগিল। আনন্দে মিন্না অধীর। তার চোখে জল, তার বুক তার প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে। সাজগোজে এখন মিন্নার বেশ একটু নজর পড়িয়া গেল। বাছা বাছা রঙের রেশমী ফিতা দিয়া সে চুল বাঁধিয়া বসে। কেমন একটা অদ্ভুত চাহনি। একটু বাঁকা হাসি মিন্নার মুখ হইতে ঠিক্‌রাইয়া উঠে। ক্রিস্তফ্ খুশী হয় হয়! অথচ আরাম পায় না। তাহার আত্মার তলদেশে কি যেন একটা আলোড়ন চলিতেছে। মিন্না গায়ে পড়িয়া কথা তোলে। তার কথাবার্ত্তায় আর আগেকার ছেলেমানুষী নাই, সে কত গম্ভীর কথা তোলে; বড় বড় কবিদের রচনা আবৃত্তি করে। ক্রিস্তফ্ প্রায় জবাবই দেয় না, সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। এই নূতন মিন্না তাহাকে যেন বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে।

মিন্নাও ক্রিস্তফকে দেখে। সে যেন কিসের প্রতীক্ষায় আছে সে নিজেই জানে না... মিন্না চায় আবার ক্রিস্তফের মুখখানি তেমনই করিয়া ঝুঁকিয়া পড়ুক, তেম-নিই—'কিন্তু ক্রিস্তফ্ যেন অতিরিক্ত সাবধান হইয়া চলে। তাহার ধারণা সে একটা বর্ব্বরের মত ব্যবহার করি-য়াছে! সে আর ও সব কথা ভাবিবেই না। মিন্না কেমন যেন অধীর হইয়া উঠিল। একদিন ক্রিস্তফ্ খানিকটা দূরে বসিয়া আছে, মিন্নার 'থাবা'র ভয়ে যেন ব্যবধানটা সে বড় করিতেই চায়। মিন্না অধীর হইয়া তড়িৎবেগে ক্রিস্তফের দিকে ছুটিয়া আসিল। তার ছোট্ট হাত দুখানি ক্রিস্তফের মুখ স্পর্শ করিল। ক্রিস্তফ্ আবেগে, লজ্জায় কাঁপিয়া উঠিল; তবু চুম্বনে চুম্বনে হাতখানি ঢাকিয়া দিল। পরক্ষণেই কেমন একটা সঙ্কোচে সে যেন ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কি একটা জালে সে যেন ঘেরা পড়িয়াছে। কত রকমের ভাবনা যেন ঝড়ের মত তাহার মনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সে কিছুই বুঝিতেছে না। তাহার মর্ম্মের গভীর তলদেশ হইতে পর্ব্বত কন্দরের কুহেলিকার মত কি একটা জিনিষ ভাসিয়া উঠিতেছে; নব জাগ্রত প্রেমের কুহেলিকায় যেন সব ছাইয়া দিয়াছে; কি একটা অস্পষ্ট ঘূর্ণীতে সে যেন ঘুর্‌পাক্ খাইতেছে! অজানা প্রবল মধুর তৃষ্ণা যেন আগুনের মতো দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল আর পতঙ্গের মতো সে যেন তার চারিদিকে ঘুরিতেছে। প্রকৃতির অন্ধ শক্তি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো সহসা যেন সমস্ত পরিচিত আবরণ বিদীর্ণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিল! কে এই **শক্তি**? কার এই দুর্জ্জয় **আবেগ**?

২য় খণ্ড সমাপ্ত

# পুস্তক ও পত্রিকা

## পরিচয় লিপি

শ্রীকণক রায়

**মানস-কমল**—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ২০৩,১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বই। দুই একটি তুলির টানে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে রেখার অক্ষরে ফুটাইয়া তুলিতে পারে কেবল তাঁহারাই যাঁহারা পাকা আর্টিষ্ট—নিপুণশিল্পী। এই জন্যই সত্যকার ছোট গল্পের বই এত দুর্ল্ভ। নরেন্দ্রবাবু পাকা ওস্তাদের মতই দুই চারিটি কথায় স্থানে স্থানে ভারি চমৎকার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কতকগুলি গল্প নিছক স্বপ্ন-রচনা—বস্তুজগতের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত কম কিন্তু তথাপি সেগুলি মানুষের মনের কল্পনার তারে এমনি ধীরে ধীরে ঘা দেয় যে, সেই খানেই একটা বস্তুজগতের রচনা করিয়া তাহা মনকে দোলা দিতে থাকে। কয়েকটি গল্প আবার বর্ত্তমান সময়ের জটিলতম সামাজিক সমস্যা-অবলম্বন করিয়া রচিত। এই গল্পগুলিতে লেখকের স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তাহা ছাড়া যে সহৃদয়তা, নিপুণ বিশ্লেষণশক্তি ও পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা সামাজিক সমস্যাগুলিকেও গল্প করিয়া তোলে তাহারও অভাব নাই। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে লেখকের সংযম। রচনা পদ্ধতির ভিতরেও যেমন তাঁহার বাহুল্য নাই, ভাবের ভিতরেও তেমনি অনর্থক আতিশয্য নাই। সহজ সরল স্নিগ্ধভাষায় তিনি ছবির পর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। সে ছবি কোথাও কল্পনার স্বপ্নে ইন্দ্রধনুর মত বিচিত্র, কোথাও বা বাস্তবের রূঢ় আঘাতে নির্ম্মম সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।

**সমাজরেণু**-শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত, দাম আট আনা। এখানি কবিতা গ্রন্থ। জাতির ভিতর যে সব বৈষম্য দোষ ত্রুটি বা গ্লানি আছে ছন্দ মিলাইয়া সেই গুলিকেই কষাঘাত করা হইয়াছে। কবিতাগুলির ভিতর লেখকের সহৃদয়তা, সংস্কার-মুক্ত উদারতা প্রভৃতির পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যে সব সামাজিক ব্যাভিচারের ছবি আঁকা হইয়াছে তাহাদের আখ্যায়িকা ভাগও অত্যন্ত করুণ। কবিতা হিসাবে লেখার ভিতর তেমন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও বই খানিতে অনেক সত্য কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা হইয়াছে। লেখকের যে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি একটা সত্যকার মমত্ববোধ আছে গ্রন্থে তাহারও পরিচয়ের অভাব নাই।

**প্রাচীন চিত্র**—শ্রীরসময় বেদান্ত শাস্ত্রী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা। দাম দশ আনা। প্রাচীন কাব্য সাহিত্যে অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলা, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী বিখ্যাত চরিত্র। 'প্রাচীন সাহিত্যে' এই কয়েকটি চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিশ্লষণ এবং উত্তর-চরিতের বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা আজকাল অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের খোঁজ রাখি না। কিন্তু এ সাহিত্য যে সৌন্দর্য্যের বিপুল সমুদ্রবিশেষ ইহার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে চরিত্র বিশ্লেষণে গ্রন্থকার যথেষ্ট শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা ভালো, কিন্তু বাহুল্যের হাত হইতে মুক্ত নহে। আলোচনার

ভিতরেও উচ্ছ্বাস আর একটু কম হইলে ভালো হইত।

**মিথিলায় ভগবান—**শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দাম একটাকা। এখানি নাটক—পঞ্চমাঙ্ক। ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও গদ্যে লিখিত। নাটকের বিষয় রামায়ণ হইতে গৃহীত। রাবণের ভয়ে ভীত দেবগণের বিলাপোক্তিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বিবাহান্তে মিথিলার রাজপ্রাসাদ কক্ষে রাম-সীতার যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বামিত্রের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় শেষ হইয়াছে।

**সপ্তপুরা—**শ্রীসুকুমার দত্ত প্রণীত। দাম পাঁচসিকা। ভারতের ধ্বংসাবশেষের ভিতর, তাহার মন্দিরে, তাহার প্রাসাদে যে কামনার বহ্নি লুকাইয়া আছে হাজার হাজার বৎসর পরেও তাহার স্পর্শ বাতাসে পাওয়া যায়। স্বপ্নের ভিতর দিয়া তাহার সঙ্গীত মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করে। সপ্তপুরা এই সঙ্গীতেরই সাতটি সুরের অভিব্যক্তি। গল্পগুলির ভিতর অতীতের অন্ধকার ও বর্ত্তমানের আলো যে আলো-ছায়া রচনা করিয়াছে তাহা উপভোগ্য। যুগে যুগে মানুষের মন কামনার উর্ব্বশীকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই কামনার অভিসার একদিকে যেমন মানুষের পরম আনন্দ অন্যদিকে আবার তেমনি চরম অভিশাপ! সপ্তপুরার কয়েকটি গল্পই এই আনন্দ ও অভিশাপের চিরন্তন দ্বন্দ্বের ছবি। গ্রন্থকারের ভাষা ভূষণ-বাহুল্যে ভারি। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িতে ক্লান্তি বোধ হয় না—কেবল মনে হয় সাজসজ্জাটা আরো খানিকটা কমাইয়া দিলে হয় তো আরো সুরম্য হইত।

**Muscle Building through Bar-Bell exercises, By ChitTun B. Sc.** দাম আড়াই টাকা। গ্রন্থকার স্বয়ং বার-বেল ব্যায়ামের দ্বারা শরীর গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এমন ভাবেই গড়িয়া তুলিয়াছেন যে দেখিয়া মনে আনন্দ হয় ও বিস্ময় জাগে। এ গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমস্তই তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। সুতরাং ব্যায়াম পদ্ধতিটি সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার সত্যকার অধিকারও আছে। ৫০।৬০ বৎসর আগেও বাঙালী দেহ-চর্চ্চা করিত, শরীরকে গড়িয়া তুলিতে জানিত। কিন্তু সম্প্রতি এদিক দিয়া তাহার যে অধঃপতন হইয়াছে তাহারও তুলনা নাই। শরীরকে উপেক্ষা করার শাস্তিও ভগবান তাহাকে পুরামাত্রায় দিয়াছেন। আজ সে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দেখিয়া মনে হয় এই শারীরিক দৌর্ব্বল্যই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। এই অভিশাপকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইলে তাহাকে আবার ব্যায়ামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরং বাংলায় এ সব গ্রন্থের আবশ্যক অল্প নহে। গ্রন্থে মোটের উপর ৩৫ খানি ছবি আছে। এক একটি ছবি ব্যায়ামের এক একটি বিশেষ ভঙ্গির ফটোগ্রাফ। ছবিগুলি মাংস পেশীর যে উন্নতির ইঙ্গিত করে তাহা দেখিয়া ব্যায়ামটির উপর যে লোভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

# বর্ষশেষে নিবেদন

আগামী সন ১৩৩৪ সাল বৈশাখ মাস হইতে কল্লোলের পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইবে।

কল্লোলের মূল্য অগ্রিম দেয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য তিন টাকা আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। ডাকে লইলে সাড়ে চারি আনা। ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র বার্ষিক পাঁচ টাকা।

বৎসরের প্রথমে ভিঃ পিঃ-তে কাগজ লইলে খরচ বেশী পড়ে এবং ভিঃ পিঃ-র টাকা আমাদের নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয় বলিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি গ্রাহকদিগের পাইতে অনেক দেরী হয়। অনেক সময় ভিঃ পিঃ-র টাকা আমাদের নিকট পৌঁছিতে এক মাসেরও অধিক হইয়া যায়।

**এই কারণে গ্রাহকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আগামী ২৫ শে চৈত্রের মধ্যে নূতন বৎসরের বার্ষিক মূল্য সাড়ে তিন টাকা যেন মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন্। তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাইতে বিলম্ব হইবে না। খরচও অনেক কম পড়িবে।**

যে সকল গ্রাহক আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিতে একান্ত অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আগামী ১৫ই চৈত্রের মধ্যে জানাইলে বাধিত হইব। নতুবা আমরা তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ-তে কাগজ পাঠাইয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইব।

**আগামী বৎসরে কল্লোলের কলেবর কিছু বৃদ্ধি পাইবে। আকার ডবল ক্রাউন আট' পেজ্ই থাকিবে।**

**দুইখানি নূতন উপন্যাস ও একখানি ইউরোপীয় উপন্যাসের অনুবাদ থাকিবে। বাংলা উপন্যাস দুইখানি দুই জন প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক লিখিবেন। ইহা ভিন্ন কবিতা, প্রবন্ধ, ও অন্যান্য অনেক নূতন বিষয় লইয়া কল্লোলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবারই চেষ্টা হইতেছে।**

আশা করি আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ কল্লোলের প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

কল্লোল কোনও বিশেষ দলের কাগজ নহে। বিখ্যাত বা অখ্যাত লেখক সকলেরই লেখা নির্ব্বাচিত হইলেই কল্লোলে প্রকাশিত হয়। কোনও কারণেই কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া কোনও লেখা ছাপা হয় না। লেখকগণ দয়া করিয়া প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন এবং অমনোনীত রচনা ফেরত লইতে বা পত্রোত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকেট দিবেন।

গ্রাহকগণ স্পষ্ট নাম ঠিকানা দিয়া মূল্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

বৈশাখ হইতে কল্লোলের বর্ষ আরম্ভ। যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই কাগজ লইতে হয়। মাঝখানের কোনও মাস হইতে কাগজ দেওয়া হয় না।

যাঁহারা ছয় মাসের জন্য গ্রাহক হইতে চান, তাঁহাদের বার্ষিক মূল্য ১৸৹ পড়িবে। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। বৈশাখ

হইতে আশ্বিন এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতি ছয় মাসের জন্য গ্রাহক লওয়া হয়।

যাঁহারা নিয়মিতভাবে কাগজ পান্ না, তাঁহাদের পক্ষে রেজেষ্ট্রী খরচা বহন করা ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। প্রতিমাসে আমরা নিয়মিত কাগজ পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু প্রতি মাসেই বা বারম্বার কাগজ না পাইলে পুনরায় কাগজ পাঠাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

নেপাল ভুটান বা ঐরূপ বহু দূর স্থানে যাঁহারা গ্রাহক আছেন, তাঁহারা বার্ষিক চাঁদার সহিত উপযুক্ত রেজেষ্ট্রী খরচ পাঠাইবেন।

গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বাংলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

যাঁহারা উচিত সমালোচনা বা পরামর্শদ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন এ বৎসরেও তাঁহাদের অভিমত ও পরামর্শ সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বিশেষ নিবেদন জানাইতেছি যে, কল্লোল তাহার অভীষ্ট আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টার চিহ্ন বোধ হয় অনুগ্রাহকবর্গ প্রতিমাসেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডাগিরি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; অথচ অনাবশ্যক কোনও পাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করিবার প্রবৃত্তিও আমাদের নাই।

মানুষের মতকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সে মত যদি মানুষের মত হয়।

বর্ষশেষে সকলকে আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছি।

প্রতি বৎসরে যে সকল প্রতিকূল আচরণ ও অবস্থার মধ্যে আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি, তাহাতে আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে আরও নির্ভয়ে আমরা সাধন করিবার শক্তি পাইয়াছি।

সকল শক্তির আশ্রয় যিনি তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত দেখিব বলিয়া আশা রাখি।

---

# কবির আত্ম-সমর্থন

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

কাব্য লিখি বলেই তুমি ঠাট্টা কর নাকি—
অনেক কথা বানিয়ে বলি, বাড়িয়ে বলি বলে'?
বদ্ধ ঘরে দিগন্তরের সুদূর ছবি আঁকি,
তাই বলে' কি কবির উপর ক্রুদ্ধ তুমি হ'লে?
তোমায় তবে বল্‌ছি শোনো আমার মনের কথা,
কেমন করে' মনের বনে জাগ্‌লো কাব্য-লতা;
ফাগুন এবং চৈত্র মাসের ধূলায় ধূসর দিনে
আগুন হাওয়ার দাহন যখন অধীর করে' তোলে,
তখন বসে' ঘরের কোণে পদ্য লেখা বিনে
ভদ্রভাবে চুপটি করে' আর কি করা চলে?
বাস্তবতায় দখিন হাওয়ার পাইনে সাড়া, তাই
পদ্যে লিখে' দখিন হাওয়া ঠাণ্ডা হ'তে চাই।

চাঁদের আলো মিষ্টি বটে, ফুলের হাসি ভালো,
কিন্তু আমার নেই কো বাগান, রুদ্ধ আমার দ্বার,
বদ্ধ ঘরেই স্বপ্ন দেখি তাই তো চাঁদের আলো,
পুষ্প আমার আকাশ-কুসুম—উপায় আছে আর?
ফুলের হাসি নাই যদি মোর বাগান করে আলো,
মনের বনে ফুল-ফোটানো—সেই ভালো, সেই ভালো।
কোনো নারীর চারু-নয়ন রয় না বাঁধা চোখে,
চারু-চরণ ছোঁয় না আমার এলিয়ে-পড়া লতা,
তাই বলে' কি না-পাওয়ার এই হৃদয়-জোড়া শোকে
মিথ্যে করে'ও বল্‌বো না কো দুটো সুখের কথা?
পাইনে বলে'ই রিক্তভাবে মিথ্যে দিয়ে ঢাকি,
কাব্য লিখি বলে'ই তুমি ক্ষুব্ধ হ'লে নাকি?

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by S. K. Chatterjee, Bani Press, 33A, Madan Mitter Lane, Calcutta.